হারেমের কালকূট

হারেমের কালকূট

শিপ্রা দত্ত

HAREMER KALKUT

By

SHIPRA DUTTA

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

প্রথম সংস্করণ—১৯৬৩

১

কয়েক বিঘা জমি জুড়ে আকাশ ছোঁয়া এক মনোরম প্রাসাদ। কি গঠনে কি সজ্জায় বিলাস বিভবের চিহ্ন পূর্ণ বিরাজ করছে। এই বিলাস-সৌধের প্রতিটি পাথরে যেন খোদিত হয়েছে দরিদ্র লাঞ্ছিত প্রজার গ্লানির মূর্ছনা—প্রতিটি স্তম্ভে যেন অনুরণিত হয়েছে এই দীন প্রজাদের সব আশার মধ্যে নিরাশার সম্ভাবনা। নিস্তব্ধ প্রাসাদে ভেসে বেড়াচ্ছে যেন এ সব অভাগাদের ব্যথাতুর হৃদয়ের কান্নার ঝঙ্কার।

অকৃতদার এক নবাব-পুত্র একদিন অসীম বিলাস বিভব সায়রে অবগাহন করেছিলেন—তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর এই বিরাট অট্টালিকা। অট্টালিকার এক বিস্তীর্ণ অংশ দখল করে রয়েছে মনোরম এক বাগিচা। এই বাগিচায় দেশী বিদেশী মৌসুমী নানা বাহারের, নানা বর্ণ গন্ধেব ফুলের হাট। মাঝে মাঝে ফোয়ারা হতে জল নিঃসৃত হচ্ছে। এরই মধ্যে রয়েছে ছোট্ট একটি চৌবাচ্চাতে নানা রং-বেরং-এর মাছ, পদ্মবন। ছোট একটা অংশ জুড়ে পাখি ও পশুশালা। নানা রং বেরং-এর প্রজাপতির হাট বসেছে এই অপূর্ব বাগানে। নানা ফুলের সারির পাশ দিয়ে গেছে সবুজ ঘাসেব গালিচা। বাগানে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াবার জন্য রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট সাদা লাল পাথরের রাস্তা। এই বিরাট বাগিচার সৌষ্ঠব ও পূর্ণ মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজন ডজন খানেক মালি।

মহলার পর মহলা, কক্ষের পর কক্ষ সাজানো রয়েছে নানা মূল্যবান আসবাব ও নানা দেশ হতে সযত্নে আহৃত নানা মূল্যবান কিউরিও পরিপূর্ণ বিরাট এই সৌধ। পোর্টিকো হতে ধাপে ধাপে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি উঠেছে। উঠেই চওড়া এক বারান্দা। এই বিরাট সৌধের চারদিক অজগর সাপের মত যেন বেষ্টন করে আছে। বিলাসী নবাব তাঁর হারেমের সুন্দরীদের সঙ্গে, কখন বা পরিজন ও পারিষদবর্গ বেষ্টিত

হয়ে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করতেন সেই অপূর্ব উদ্যানের শোভা। সাদা পাথরের কতকগুলি বেঞ্চি বাগানের ভেতরে স্থানে স্থানে রয়েছে। এই শ্বেত পাথরের বেঞ্চিগুলি যেন বাগানের সৌন্দর্যকে অধিকতর মনোরম করেছে। কিন্তু অন্যান্য ধনী প্রাসাদের মত নগ্ন নারী দেহের প্রস্তরমূর্তিতে বাগানের শুচিতা এখানে কলুষিত হয়নি। এ যেন প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির লীলাভূমি। নিপুণ শিল্পীর তুলিকায় যেন এক অপরূপ বাগিচা ফুটে উঠেছে। পরিচ্ছন্ন বাগিচায় কেবল নানা রং-বেরং-এর ফুলের হাট নয়—নানা ফুলের পবিত্র সৌরভে পরিবেশটা আমোদিত।

ঢুকেই একটি বিশাল কক্ষ। যেখানে এক সঙ্গে কয়েক শত ভদ্রলোকের বিলাস আসন পাতা যায়। কক্ষটির আসবাবপত্র সবই বিদেশী ভঙ্গিমায় সজ্জিত। দামী পারস্যের গালিচার উপর যখন পা ফেলে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পোর্টিকো দিয়ে এই কক্ষে ঢুকতেন—তাঁদের পদধ্বনিতে কক্ষের গম্ভীর আবহাওয়া চঞ্চল হতো না।

নবাবপুত্র ছিলেন তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা। তাঁর এই কক্ষে বসতো রাজনৈতিক আসর। প্রাতঃস্মরণীয় দেশবরেণ্য জাতি-নির্বিশেষে নেতার দলকে প্রায়ই তখন দেখা যেতো এই প্রাসাদে।

প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে রয়েছে আর একখানি কক্ষ। কক্ষের চারদিকের দেওয়াল ইটালীয়ান আয়নায় মণ্ডিত। যে আয়নায় অনুক্ষণ প্রতিবিম্বিত হতো কক্ষের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিবিম্ব। বহু দূর দেশ হতে আগত বাইজীদের মধুর কণ্ঠের গানে সম্মোহিত হতো গুণ-গ্রাহী রসিকরা। সে কক্ষ আজ অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে তবলা, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, একতারা, হারমোনিয়াম, বাঁশী—আরও নানা রকম বাদ্যযন্ত্র—সেই কক্ষ একদিন সুরা ও সুরের লহরীতে মুখরিত হয়ে উঠতো। পুরু দামী গালিচা পাতা রয়েছে শ্বেত পাথরের মেঝেয়। তার উপর পড়ে রয়েছে বহু তাকিয়া। সারি সারি গোলাপপাশ, আতরদানী ইত্যাদি জলসার আসর জমাবার নানা উপাদান। যে গালিচায় বসে সুন্দরী সুগায়িকারা গানের মূর্চ্ছনায়

মৎকৃত করতো সুরসিক শ্রোতাদের—সেই কার্পেট অযত্ন অবহেলায় রু ধূলোর আস্তরণে লজ্জায় আজ যেন মুখ লুকোচ্ছে। কক্ষের ালোর ঝালরগুলির উপরও অযত্নের ছাপ। যে আলোর রশ্মি সন্ধ্যা-ারার আলোকে নিষ্প্রভ করে দিতো, সেই আলো আজ নিজেকেই ারিয়ে ফেলেছে অন্ধকার গহ্বরে। পড়ে রয়েছে কেবল তার বাহ্যিক াট। অযত্নে অবহেলায় বিদায় নিয়েছে তার চাকচিক্য। নবাবপুত্র নিজেও সুগায়ক ও দক্ষ যন্ত্রী ছিলেন। গানের মর্যাদা দিতে ও গুণীর াদর তিনি করতে জানতেন।

নবাবপুত্র কেবল গানই পছন্দ করতেন না, তাঁর জ্ঞান পিপাসাও ছিল তীব্র। তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁরই বিরাট গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের সংলগ্ন কক্ষই পাঠাগার। কত দেশের কত ভাষার জ্ঞানকে তিনি আহরণ করেছিলেন এই গ্রন্থাগারে। কত মণীষী কত কবি সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকের মন বাঁধা আছে এই গ্রন্থাগারে। স্রোতের মত হাজারে হাজারে বই সংগৃহীত হয়েছে এই পাঠাগারে। বিরাট বিরাট আলমারি ও র‍্যাকে র‍্যাকে বই সাজানো গুছানো রয়েছে। যেন বই-এর পাহাড়। যে কোন জ্ঞানপিপাসু তার জীবন অতিবাহিত করতে পারে এই পুস্তকারণ্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে। গ্রন্থ নির্বাচনের মধ্যেও নবাবপুত্রের রুচি ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর রয়েছে।

এই ভাবে কক্ষের পর কক্ষ মহলার পর মহলা সাজানো রয়েছে যথাস্থানে। মনে হয় না যে বছরের পর বছর এই প্রাসাদে লোক বাস করেনি বা কোন আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়নি।

এই নবাবপুত্রের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন আফগানীস্তান হতে। সে আজ কত যুগ! নবাব ইউনুসের মধ্যে আফগানির রক্ত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁকে খাঁটি বাঙ্গালী বলা যায়। অবশ্য চেহারার মধ্যে তখনও ফুটে ছিল আফগানীর ছাপ। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন আফগানী বংশধরের উত্তর পুরুষ এবং মাতার ছিল ইরাণী রক্ত। তাই বাঙ্গালীর মত খর্বাকৃতির শ্যামাঙ্গী তিনি নন।

পরন্তু উঁচু, লম্বা, দুধে-আলতা গায়ের রং। পিটানো স্বাস্থ্য—সব কিছু মিলিয়ে তাঁকে সুপুরুষ বলা চলে।

দেয়াল জুড়ে পূর্বপুরুষ সহ ইউনুস আপাদমস্তক লম্বিত সোনার ফ্রেমে আঁটা তৈলচিত্র হতে তাঁর ও তাঁর পূর্ব পুরুষদের রূপের ও বংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

কেবল চেহারাই নয়। সব রকম গুণই তাঁর আছে। প্রচীন কালের নবাব বংশের আলালের ঘরে দুলালের মত তিনি আয়াসী, অলস, সুরাসক্ত ছিলেন না। পরন্তু তাঁর পিতা তাঁকে যত্ন করে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন। পলিটিক্যাল সায়েন্সে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ ডিগ্রী এনেছিলেন। মুসলীম কৃষ্টির চেয়ে পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির প্রতি তাঁর আকর্ষণ অধিকতব ছিল। তাই বলে আপন কৃষ্টিকে তিনি অবহেলা করেননি। তাঁর প্রাসাদে দুই কৃষ্টি পাশাপাশি ছিল। এক কথায় এক নির্মল সরল উদার জীবন।

এই প্রাসাদটি কিনতে এসেছিল এ যুগের রথীন রায়, সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু রবীন সেন! প্রাসাদটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখে রথীন রায় নবাব স্টেটের ম্যানেজার মিস্টার প্রকাশ সোমকে বললো, আপনার থেকে নবাব ও তাঁর পূর্বপুরুষদের সব কিছু শুনলাম, কিন্তু মিস্টার সোম, বলতে পারেন, এত সস্তায় কেন এই দুর্মূল্য প্রাসাদ বিক্রি করা হচ্ছে?

—নবাবের পূর্বপুরুষদের কোন কিছুই বলা হয়নি। মাত্র ভূমিকা-টুকু করেছি। এঁদের কাহিনী যে কোন একটি আর্কষণীয় উপন্যাসের চেয়ে কম thrilling নয়। পরে তা শোনাবো।

জিজ্ঞেস করছিলেন কেন বিক্রি হচ্ছে? এই নবাবপুত্রের অপমৃত্যু ঘটেছিল পাকিস্তানে। ইনি ছিলেন নবাব ফের্দৌসীর কনিষ্ঠ পুত্র ইউনুস। পূর্ব পাকিস্তানে যাবার পূর্বে তিনি তাঁর একমাত্র বোনকে ও তার স্বামী নবাব সুরাবর্দিকে তাঁর এখানকার বিরাট সম্পত্তির ট্রাস্টি করে গিয়েছিলেন। এবং জনসাধারণের হিতে এই সম্পত্তির আয়-ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই স্নেহময়ী

বোনেরও মৃত্যু হয়েছে। নিঃসন্তান বৃদ্ধ নবাবও বেহস্তে চলে গেছেন। তাই তিনি তাঁর নিজস্ব ও শালার সম্পত্তির দানপত্র করে নিঃস্বত্ব হয়ে গেছেন।

তা ছাড়া নবাবী জমিদারীর যুগ শেষ হয়েছে। যে গরু দুধ দেয় না তার সেবা যত্ন কয়জন গৃহস্থ বা মনিব করে? তাই দেশে দেশে নবাব, বাদশাহ বা রাজাদের বিরাট বিরাট প্রাসাদ আজ পরিত্যক্ত জীর্ণ বাসের মত। এই সব বিরাট প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও ভৃত্য পরিচারকের প্রয়োজন আজ তা নবাব, রাজাদের সামর্থ্যের বাইরে। স্বাধীন ভারতে এদের স্টেট সরকার নিয়ে নিয়েছে— তার বিনিময়ে যে সামান্য মাসোহারা এঁরা পান তাতে তাঁদের নবাবী আমলের চাল-চলন বজায় রাখা সম্ভব নয়। হয়ত অনেক নবাবের পোষ্য প্রতিপালনও সম্ভব হচ্ছে না। তাই এ সব নবাব বাদশারা আজ দশের উর্ধ্বে নন। আভিজাত্য হারিয়ে দশের মধ্যেই মিশে গেছেন। আজ তাই মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারী, নবাব সিরাজদৌল্লার প্রাসাদের এমন অবস্থা! বহু রাজপ্রাসাদ আজ দাতব্য চিকিৎসালয়ে বা সরকারী বড় বড় অফিসে গৃহীত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজপরিবারের ব্যক্তিরা নিজেদের কোনও রাজপরিবারভুক্ত বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা অনুভব করেন। মিশে গেছেন তাঁরা সাধারণের মধ্যে। নিজেরা আজকাল লেখাপড়া শিখে সাধারণের সঙ্গে জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগীতায় নেমেছে। অনভ্যাসে তারা স্খলিত পদক্ষেপে পথ হারাচ্ছে--বিপথ-গামীও হচ্ছে অনেকে। নবাবী রক্তের কণিকা তাদের মধ্যে নেশা ধরায় কখনও কখনও—যার ফলে তারা হারিয়ে ফেলে নিজেকে। স্টেট হারা, উপার্জন হীন হয়েও সরকারের হরেক রকম ট্যাক্সের চাপে এই সব প্রাক্তন নবাব পরিবারের বংশধরেরা জর্জরিত। তাই আজ তাঁরা ভাবছেন এই সব প্রাসাদ তাদের কাছে আশীর্বাদ নয়— অভিশাপ। তেমনি এক হতভাগ্য নবাব পরিবারের কাহিনী আপনা-দের শোনাব।

রথীন রায় প্রকাশ সোমকে প্রশ্ন করলেন, যাঁর প্রাসাদ

আমি কিনতে এসেছি তাঁর সঙ্গে কি সেই কাহিনীর কোন সম্বন্ধ আছে ?

—নিশ্চয়ই। তাই তো আমি শোনাতে চাইছি। আমি এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত আমার যৌবনের প্রারম্ভ হতে। অর্থাৎ আমার বাবাও ছিলেন এই স্টেটের ম্যানেজার। এক কথায় বলা যায় পুরুষানুক্রমিক ভাবে আমরা নবাব ফের্দৌসীর স্টেটে কাজ করে আসছি। পরে আমি নবাব সুরাবর্দির স্টেটের ম্যানেজারও হই। তাই নবাব পরিবারের অনেক কাহিনীই জমা রয়েছে আমার মন কন্দরে।

রথীন রায় বৃদ্ধ প্রকাশ সোমের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, তবে দেরি করবেন না। আমার এই বন্ধু রবীন সেন একজন প্রখ্যাত লেখক। সুতরাং আপনার নবাব পরিবারের কাহিনী হতে হয়ত তার একটি বই-এর খোরাক মিলে যাবে এবং এখানে আসাও রবীনের সার্থক হবে।

—সেই বিরাট কাহিনী এত অল্প সময়ে বলা যাবে না। যদি অসুবিধে না হয়, তবে বেলা চারটার সময় আপনারা দুজন আমার দীন কুটীরে আসুন। আমার ওখানেই এক কাপ চা খেতে খেতে বলা যাবে। আমিও চাই এ সব কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে থাকুক। ঔরঙ্গজেবরা যুগে যুগে নানা মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। সে সব কাহিনীই শোনাবো। দয়া করে আসবেন কি গরীবের কুটীরে ?

—ঠিক আছে। আমরা আপনার গল্প শুনতে যাবো। চা'য়ের প্রয়োজন হবে না। কেবল নবাবদের কাহিনী শোনাবেন।

২

নির্দিষ্ট সময়ে রথীন রায় ও রবীন সেন প্রকাশ সোমের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে এলো। নবাবের ম্যানেজার, সুতরাং পুরো নবাবী চালে না হলেও মিনি নবাবী চালে সাজানো তাঁর দ্বিতল ছোট্ট বাগিচা সমন্বিত বাড়িটা—একটি সুন্দর ছোট্ট প্রাসাদ।

দরোয়ান খবর দিতেই একটি ছোকরা ভৃত্য এসে আগন্তুকদের নিয়ে গেল ভেতরে বসবার ঘরে। আধুনিকতম সাজে পরিপাটি ভাবে সাজানো আছে ঘরটি। বৃদ্ধ মিস্টার সোম ড্রেসিং গাউন পরে আগন্তুক-দের প্রতীক্ষায় ছিলেন। উভয়ে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে এই দুই যুবককে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন। তিনি আরও বললেন, যদিও আপনারা আসবেন বলেছিলেন, তবু আমি ভাবতে পারিনি সত্যি এই বৃদ্ধর মুখ থেকে হারিয়ে যাওয়া দুই নবাব পরিবারের ইতিহাস শুনতে কষ্ট করে আপনারা আসবেন। আমি ভারী খুশী হয়েছি আপনাদের দেখে। আমি একা যে-সব দুঃখের কাহিনীর নীরব দ্রষ্টা, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন, তবে লুপ্ত নবাব বংশের ইতিকথা পাঠকদের মনে দাগ টেনে দেবে।

মিস্টার সোমের কথা শেষ হতেই এক অনিন্দ্য সুন্দরী তন্বী একটি চাকরের হাতে ট্রেতে খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম এনে আগন্তুকদের সামনে টেবিলের উপর রাখলো। মিস্টার সোম যুবতীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন আমার এই নাতনি রমা। রমা নামটি সে তার জীবন দিয়ে সার্থক করেছে। বিদ্যায় সরস্বতী—সাইকোলজি নিয়ে সে রিসার্চ করছে। অল্প দিন আগে তার রিসার্চের থিসিস সাবমিট করেছে। এজন্য তাকে অক্সফোর্ডে যেতে হবে। আমার নাতনি বলে বলছি না, রমা আমার লক্ষ্মী মেয়ে।

দুই অপরিচিত যুবকের সামনে আত্মপ্রশংসা শুনতে সঙ্কোচ বোধ হওয়ায় রমা—কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললো, আঃ দাদু, কি সব আজে বাজে কথা বলে ওঁনাদের ভ্যালুয়েবেল সময় ওয়েস্ট করছ। তার চেয়ে যে জন্য ওঁনারা এত কষ্ট করে এসেছেন তাই শুনিয়ে দাও।

যুবকদ্বয় বলে উঠলো—না, না, আমরা কষ্ট করে আসিনি। মিঃ সোমের কথা শুনতে আমাদের বেশ ভাল লাগছে। সব কিছু শুনতেই বেশ ভাল লাগছে।

রমা উঠে পড়ে হেসে বললো—আপনাদের এ সব অবান্তর কথা শুনতে ভাল লাগলেও আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না। আমাকে

মাপ করবেন, আমার একটা এপয়েন্টমেণ্ট আছে। আমায় এবার উঠতে হবে। দাদুর দিকে তাকিয়ে বললো—সুজিতার আজ বার্থ-ডে। তোমায় বলেছিলাম, মনে আছে তো? আমি ওদের পার্টিতে যাচ্ছি।

—ওঃ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম তোর বান্ধবীর আজ জন্মদিন। তা যা দিদি, দেরি করিস না। আমার আশীর্বাদ জানাস।

সুন্দরী রমা হাত জোড় করে উভয়ের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে বললো—অপনারা সাই ফিল করবেন না। এ্যাট্ হোম ফিল্ করুন। আমাদের বেয়ারাকে বলে গেছি—সে আপনাদের অভিরুচি মত চা, কফি যা প্রয়োজন দিয়ে যাবে। আজ আমি আসি।

রথীন রায় হেসে উত্তর দিলো, আমাদের জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। মিঃ সোমের গল্প আশাকরি আমাদের খুবই আনন্দ দেবে। আপনি বান্ধবীর বার্থ-ডে ভালভাবে সেলিব্রেট করে আস্থন।

মিঃ সোম আরম্ভ করলেন তাঁর গল্প। নবাব ফর্দৌসীর ছিল তিন ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে হুমায়ুন, মেজ ছেলে সাজাহান ও ছোট ছেলে ইউনুস। মেয়ে সুরাইয়া।

হুমায়ুন ছিলেন পুরো দস্তুর নবাবপুত্র। তাঁর হাল-চাল সবই নবাব সুলভ। শিক্ষার দৌড় কিন্তু তাঁর বেশী দূর গড়ায়নি। কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পড়েই লেখাপড়া থেকে বিদায় নিয়ে শিকার, গান, বাজনা নিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতেন। বিয়েও করেছিলেন খানদানী বংশের এক দুহিতাকে। তাঁর এক ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। সুর, সুরা ও শিকারের নেশাই হুমায়ুনকে মাতাল করেছিল। সরল অমায়িক নবাবপুত্র সবার অতি প্রিয়। বন্ধু ও বয়স্য নিয়েই তাঁর জীবন কাটতো। তাঁর ঘটলো অপমৃত্যু।

—অপমৃত্যু কেন? সব ভাইর কি অপমৃত্যু হয়েছে?

—অপমৃত্যু ঘটলো নিজেরই জামাতার হাতে।

—এঁরা কি পশ্চিম বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার বংশের কেউ?—প্রশ্ন করলো রবীন।

—না না, এঁরা সবাই পূর্ব বাংলার নবাব। এঁদের স্টেট ছিল

সোনার পূর্ব বাংলায়। হাঁ তিন ভাই-এরই অপমৃত্যু ঘটেছিল। সে সব কাহিনীই তো শোনাতে চাইছি।

—মেজ ভাই সাজাহানের কাহিনী এবার বলুন।

—বৃদ্ধ মিঃ সোম হেসে বললেন—ধীরে বন্ধু ধীরে। আগে গলাটা ভিজিয়ে নিই। এ সময় একটু আধটু ড্রিংক না করলে আমার চলে না। আপনাদের কি ওসব চলে? যদি আপত্তি থাকে তবে আপনাদের জন্য কফি দিতে বলি।

রথীন দেখলো মিঃ সোম নবাবের ম্যানেজারী করে পুরো দস্তুর নবাবী দোষগুলিও আয়ত্ত করেছেন। যাক, ইতিহাস যখন শুনতে এসেছে তখন ধৈর্য ধরে সব কিছু শুনতে হবে। তাই সে উত্তর দিলো, আমাদের জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। এই তো এত চা ও খাবার খাওয়া হলো। আমাদের আর কিছু লাগবে না।

—তা বললে কি চলে? আমি ড্রিংক করবো আর আপনারা শ্রেফ শুকনো কাঠ গলায় কথাগুলো গিলবেন—তা কি হয়? বেশ, হট কিছু আপনাদের যদি ভাল না লাগে, তবে কোল্ড কোন ড্রিংক আপনাদের দিতে বলছি—বলে তিনি সামনের টেবিলে রাখা একটা বেল বাজাতেই একটা ট্রেতে করে একটা কাঁচের জাগে কিছু বরফের টুকরো (কিউব) ও এক বোতল হুইস্কি ও একটা গ্লাস রেখে দাঁড়াতে মিঃ সোম হুকুম দিলেন, দো গ্লাস কোল্ড অরেঞ্জ জুস লে আও। আগন্তুকদের আপত্তি সত্ত্বেও কোল্ড ড্রিংক এলো।

মিঃ সোম উভয়ের হাতে দুটো গ্লাস তুলে দিয়ে বললেন—নিন, গলাটা ভিজিয়ে সরেস না করলে নবাবদের কীর্তি-কাহিনী জমবে কেন? যাক, কি বলছিলাম? দেখুন বয়েস তো কম হলো না, তাই খেই হারিয়ে ফেলি।

রথীন খেই ধরিয়ে দিয়ে বললো—এবার মেজ ভাই সম্বন্ধে বলবেন।

—হাঁ, মেজ ভাই সাজাহান ছিলেন শিল্পী মনে-প্রাণে। রাতদিন তার স্টুডিওতে বসে তুলি আর রং দিয়ে একাগ্র মনে এঁকে চলেছেন

সব জীবন্ত ছবি। ক্যানভাসের উপর রঙের তুলি টানতে টানতে সাজাহান তাঁর কল্পনার রাজ্যেই বিচরণ করেন। নীল আকাশ, সবুজ প্রকৃতির কোলে তিনি ফুটিয়ে তোলেন কত অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—যেন তারা সবাই জীবন্ত প্রাণবন্ত। বহির্জগতের সঙ্গে ছিল না তাঁর কোন সম্পর্ক। এক মনে এক প্রাণে তিনি যেন প্রকৃতির মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। রঙের নেশা ছাড়া অন্য কোন নেশায় তাঁকে মত্ত করতে পারেনি। নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুশোভিত দেশ ভ্রমণ এবং সে সৌন্দর্যকে সাজাহান আপন ক্যানভাসের মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করতেন। কোন রাজনীতি বা পারিবারিক ব্যাপারে সাজাহান নেই।

—তিনি কোথায় থাকতেন ?

—কাশ্মীর ছিল তাঁর মানস সুন্দরী। কাশ্মীরের সুন্দরীরা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। গুলমার্গ হতে খিলান মার্গে যাবার পথে তিনি দেখেছিলেন এক অপ্সরীকে।

—সাজাহান বুঝি তাঁর প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন ?

—ড্রিংক এক সিপ্ টেনে তিনি বললেন, ধৈর্য ধরুন। তাল কেটে দেবেন না। এক একটি কাহিনী শুনে রোমাঞ্চিত হবেন। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে বিশ্বকর্মার সৃষ্ট তিলোত্তমা—সৌন্দর্যের অনবদ্য প্রতীক। তিলোত্তমাও যেন এই সুন্দরীর কাছে হার মানতো। ততোধিক মিষ্টি তার মন ভুলানো হাসি। সাজাহানও হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর মনকে। ডালিমকুমারী যেন প্রকৃতির একটি ডালিম ফুল। দুধে আলতা মেশানো রং, টানা নাক চোখ মুখ যেন এ মর্ত্যের সুন্দরী নয়, দেবলোকের শাপভ্রষ্টা কোন দেবকন্যা। আপনভোলা সাজাহান ভুলে গেলেন নিজের ঐতিহ্য, স্টেটাস্, পরিচয়। পাহাড়ী ঝর্ণার মত ডালিমকুমারীর টানে তিনি ছুটে যেতেন বার বার তার কাছে। ঘোড়সওয়ার গোলাম আলীর বোন ডালিমকুমারী। গুল-মার্গ হতে যাওয়ার পথেই পড়ে গোলাম আলীর জীর্ণ কুটীর। ভাই সওদা করে নিয়ে চলেছিল। পথে বোনকে ডেকে সামান্য সওদা তার হাতে তুলে দিলো।

ঘোড়ার ওপর ছিল সাজাহান। দরিদ্র তন্বী, সুন্দরী ডালিমকুমারী নিজেরই অজ্ঞাতে সাজাহানের মন চুরি করেছিল। তারপর হতে সাজাহান বার বার ছুটে এসেছে গোলাম আলীর জীর্ণ কুটীরে। ডালিম-কুমারীকে নিয়ে কখনও ডাল হ্রদে, কখনও নিশাদ বাগ, শালিমার বাগ, ভেরী নাগ, সোনা মার্গ, খিলান মার্গ—কাশ্মীরের নানা বাগিচা, হ্রদে বা পর্বতে বন্দরে বিহার করেছে।

—রথীন বলে উঠলো, এ তো এক রকম পারভারশান।

—মাই ডিয়ার ইয়াং বয়, হোয়াই আর ইউ ফরগেটিং ছাট লাভ ইজ ব্লাইণ্ড।

—রবীন বললো, থাম রথীন। আপনি শুরু করুন।

—মিঃ সোম আর এক পেগ হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বললেন, তারপর কি হলো জানেন? গোলাম আলী প্রতিবাদ করে বলেছে—সাহেব, আপনি মুসাফির। দুদিন পর অন্য দেশে চলে যাবেন। ভুলে যাবেন আমার দুঃখী হতভাগী বোনকে। আপনার দুদিনের সখে হয়ত আমার হতভাগী বোনের সারা জনমটাই বরবাদ হয়ে যাবে। আপনাদের মত ধনী লোকদের চোখে এরা ছোট শিশুর কাছে খেলনার মতই। খেলার শেষে শিশু যেমন তার খেলনা ভেঙ্গে রেখে যায়—তার দিকে ফিরে দেখে না, তেমনি এ সব অভাগীকে নিয়ে দুদিন ফুর্তি লুটে এদের আপনারা আঁস্তাকুড়ে ফেলে যান। এদেরও যে মন বলে কিছু আছে—এদেরও যে সমাজ, ইজ্জৎ বলে কিছু আছে—তা আপনারা ভুলে যান। কিন্তু আপনাদের এ সব সাময়িক ফুর্তির পরিণামে আমাদের মত দরিদ্র ঘরের কত কিশোরীর কোমল মন যে ক্ষত বিক্ষত করে যান, তার ইয়ত্তা নেই। এরাও যে মানুষ, এদেরও যে হৃদয় আছে—তা আপনারা ভুলে যান। এরা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। দেহের বেসাতী এদের পেশা নয়। সুতরাং সমাজের নির্মম দণ্ড এদের পেতে হয়। কিন্তু এরা অবোধ। আপনাদের ছলনাকে এরা সত্য বলেই ভুল করে। তাই প্রকৃতিকে এরা যেমন ভালবাসে—তেমনি নিজের অজ্ঞাতে আপনাদেরও ভালবেসে ফেলে পরিণামের কথা চিন্তা করে না। আপনারা খানদানী বংশের

লোক—আমাদের মত গোলাম ঘরের মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি না-ই বা খেললেন। আপনার তুরন্ত খেয়ালের খেলনা নাই বা মনে করলেন আমার বোনকে। মাপ করুন আপনি—দূরে সরে যান।

কিন্তু সাজাহান পারেনি নিজেকে সামলাতে। তিনি জানতেন গোলাম আলী রোজ সকালে মুসাফিরদের নিয়ে খিলান মার্গ, সোনা মার্গে যায় এবং সূর্যাস্তে ফেরে। সাজাহান তখন গোলাম আলীর সঙ্গে লুকোচুরি শুরু করলেন। গোলাম আলীর অবর্তমানে তিনি ডালিমকুমারীর কাছে আসতেন—তাকে নিয়ে নানা রম্য জায়গায় অভিসারে বের হতেন। যতই সাজাহান ডালিমকুমারীর সঙ্গে মিশতেন, ততই যেন কেমন এক মদিরার নেশায় তাকে পেয়ে বসলো। সাজাহান নানা পরিবেশের মধ্যে ডালিমকুমারীকে নিয়ে নানা রকম চিত্র অঙ্কিত করে চলেছেন। যেন ডালিম চিত্রশিল্পীর এক পূর্ণাঙ্গ মডেল। প্রেমের নানা গল্প করে চলেছেন যার অর্ধেকও হয়ত ডালিমকুমারী বুঝতো না। তবু কিসের টানে ডালিমকুমারী মিঞা ভাইয়ের নিষেধ অমান্য করে পরদেশী খেয়ালি এক শিল্পীর কাছে ছুটে আসতো—তা সে নিজেই জানে না। এ যেন চুম্বকের আকর্ষণ। এজন্য কত গালমন্দ, লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে মিঞা ভাইয়ের কাছে—তবুও সাজাহানের ডাকে সাড়া না দিয়ে সে পারেনি। ঘর ছেড়ে সে বের হয়ে পড়েছে।

অবশেষে সাজাহান কাশ্মীর হতে চিঠি দিয়ে দেশে জানিয়েছেন এতদিনে তাঁর সাদি করবার ইচ্ছে হয়েছে। কাশ্মীর থেকে ফিরবার সময় কাশ্মীরী বেগম সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন।

নবাবপুত্র—তাই প্রথমেই প্রশ্ন উঠলো কাশ্মীরী বেগমের খানদান সম্বন্ধে। সাজাহানের রাগ, অনুরাগ, ভালোবাসা, ভাবপ্রবণতা সবই ভেসে গেল নবাব পরিবারের ঐতিহ্য ও বংশ মর্যাদার মধ্যে।

কড়া উত্তর গেল—খানদানী বংশের ছেলের যে কোন ঘরে সাদি করা চলে না। তবে বাঁদি করে রাখতে যদি চাও, তবে একটি কেন দশটি কাশ্মীরী ললনা তুমি আনতে পারো। কিন্তু তাদের গর্ভজাত কোন সন্তান নবাব পরিবারভুক্ত বলে দাবি করতে বা সম্পত্তির অংশীদার হতে

পারবে না—এ কথা জানিয়েই যেন কাশ্মীরী অপ্সরীদের নিয়ে আসা হয়। এর অন্যথা হলে সাজাহানের মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবে—নবাব প্রাসাদে তার স্থান হবে না।

সাজাহান স্বদেশে ফিরে যেতে চাননি। সমাজ, সংসার, পারিবারিক ঐতিহ্য গরিমা সব কিছু হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে শ্রীনগরেই বসবাস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও নবাব পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় আপত্তি আসলো। তারা বুঝেছিল, ইতিহাসের সাজাহানের প্রেমের সায়রে ডুব দিয়ে তিনি দ্বিতীয় সাজাহানের নাম খোদাই করে রেখে যেতে চান। তাই নবাব পরিবার সাজাহানের সে কল্পনাতেও বাধ সাধলো।

কিন্তু সাজাহানের প্রেম ছিল অকৃত্রিম, নির্মল। তিনি ডালিম-কুমারীকে প্রতারিত করতে চাননি—তাই তাকে বিয়ে করে সহধর্মিনীর মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন, বাঁদিরূপে নয়। নিজের অক্ষমতা, নির্ভরতা, অপদার্থতা তাঁকে বৃশ্চিকের মত দংশন করতে লাগলো। সামান্য একজন শ্রমিকের যে যোগ্যতা আছে, যে স্বাধীনতা আছে, নবাব-নন্দন হয়ে তাঁর সেই যোগ্যতা বা স্বাধীনতা নেই। সাজাহান শিল্পী। সুন্দরের

না। বাবা দাদার বাগিচায় দেখেছেন বসরার গোলাপ, কাশ্মীরের গোলাপ, গাজিয়াবাদের গোলাপ পাশাপাশি। তাদের মধ্যে কোন মান অভিমানও নেই। মানুষে মানুষে তফাৎ। এ সমাজের সৃষ্টি—মানুষের সৃষ্টি। ইংরেজ কবি Keats-এর মতে 'A thing of beauty is a joy for ever.' পরিবারের মিথ্যে মান মর্যাদা সাজাহান ও ডালিমের মধ্যে ছেদ ঘটাতে পারবে না।

ডালিমকুমারীকে সাজাহান যে অনেক রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তার এই দারিদ্র্যের অবসানান্তে তাকে নবাব প্রাসাদের বিলাসের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কত ভালোবাসার কথা সরলা যুবতী ডালিমকুমারীকে শুনিয়েছেন। ডালিমের কাছে সাজাহান তার স্বপনপুরীর রাজপুত্র। কিন্তু তাসের ঘরের মত যে তা এমন ভাবে ভেঙ্গে যাবে—এ যেন সরল,

সংসার-অনভিজ্ঞ, বালকমতি সাজাহানের ধারণাতীত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর সাধনার ধন—তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলি বিক্রি করে তিনি জীবনধারণ করবেন—এই সঙ্কল্প করলেন। তাই কাশ্মীরে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া করে তাঁর চিত্রিত ছবির প্রদর্শনী করে—তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এতে সাজাহানের ব্যয়-বাহুল্যই মাত্র হলো—আয় কিছুই তেমন হলো না। পাশ করা নামী শিল্পী নন—ডিগ্রী নেই—তাই শিল্পীর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোথাও চাকরির সম্ভাবনা নেই। এসব নানা চিন্তা ও প্রতিকূল পরিবেশে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। নিজের জীবনের প্রতি এলো ধিক্কার। নিজের ভাগ্যর প্রতি এলো ঘৃণা।

—মিঃ সোম, আপনি সাজাহানের মনের খবর কি করে পেলেন?

—না আমি জ্যোতিষী নই। সাজাহানের ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল। সে ডায়েরী সব প্রকাশ করেছে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সাজাহানের জিনিষপত্র কাশ্মীর থেকে আনতে আমাকেই যেতে হয়েছিল। সেই অপ্সরীর ছবি দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্থানীয় লোকদের থেকেও অনেক তথ্য পেয়েছিলাম।

—সেই ডায়েরীটা কি আছে?

—না, পোকায় কেটে বহু মূল্যবান গ্রন্থের সঙ্গে ঐটিও বিলুপ্ত হয়েছে। নতুবা আমি শিল্পীর মুক্তার মত হস্তাক্ষর আপনাদের দেখাতে পারতাম। আপনারা তাঁর শিল্পীমনের সম্যক পরিচয়ও পেতেন।

—যাক, সৌভাগ্য যখন হলো না, তখন আপনার মুখেই অন্য সব রোমান্টিক কাহিনী শুনি।

—এদিকে গোলাম আলী ডালিমকুমারীকে পাত্রস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যৌবনের দুর্বার আকর্ষণে সে ভেসে যাবে—বড় ভাই হয়ে তা সহ্য করতে পারে না। অথচ ভিন্‌দেশী নবাবপুত্রর রাহুগ্রাস হতে বোনকে তার মুক্ত করতেই হবে। গোলাম আলী জানে এরা ফূর্তি করতে জানে—কিন্তু নারীর সম্মান দিতে বা স্ত্রীর মর্যাদা দিতে জানে না। তাই ডালিমকুমারী যতই তাকে আশ্বাস দেয় যে, সাজাহান

তাকে সাদি করবে কথা দিয়েছে—ততই গোলাম আলী ডালিমকে স্বদেশী পাত্রে পাত্রস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গোলাম আলী জানে এসব ধনীপুত্ররা যদি বা সাদিব ছলে একটা ছেলেখেলা করে এ সব কাশ্মীরী তনয়াদের নিয়ে যায়,—কিন্তু স্বদেশে এদের বাঁদি বলেই পরিচয় দেয় বা বাঁদির মতই ব্যবহার করে। তাই ডালিমকুমারীর অদৃষ্টে তেমন কিছু ঘটবার আগেই সে বন্ধু বন্দে আলীর সঙ্গে ডালিম-কুমারীর সাদি স্থির করে। একই পেশা দুই বন্ধুর। বন্দে আলীর সংসারে বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—তাই সংসার চালাবার জন্য বন্দে আলীর সাদি করতেই হবে।

ডালিমকুমারী স্বপ্ন দেখে, নবাব-নন্দন সাজাহানের বেগম রূপে সে যাবে বাংলা মুল্লুকে। সেখানে নেই এমন ধবল পর্বত, ফুলের হাটে প্রকৃতির সজ্জা, নেই এমন মন ভোলানো মেঘের খেলা, হ্রদ ও বাগিচা—আছে কেবল শ্যামল সমতল ভূমি। যেখানে ডালিমকুমারী ডুবে থাকবে ভোগঐশ্বর্যে, আহার করবে নাম না জানা কত চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। কত দামী দামী মণি মুক্তার প্রসাধনে নিজেকে সে রাত দিন সজ্জিত করবে—কেবল ঝুটা পাথরের ও ফুলের অলঙ্কারে আর নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে হবে না।

কিন্তু ডালিমকুমারীর স্বপ্ন সফল হবার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। সাজাহানের অভিভাবকরা চিঠির পর চিঠি দিয়ে সাজাহানের থেকে কোন উত্তব না পেয়ে প্রমাদ গুনলো। একরোখা ভাই বুঝি কাশ্মীরী বেগমে মজেছে। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্য তারা নষ্ট হতে দিতে পারে না। তাই স্টেট হতে সাজাহানের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেলো।

অভিমানী সাজাহান নীরবে সবই সয়ে গেলেন। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন না। হয়ত নবাব সাহেব বেঁচে থাকলে এমনটি হবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন পুত্রগত প্রাণ। বিশেষ করে শৈশবেই সাজাহান মাকে হারিয়েছেন। তাই নবাব

সাহেব পুত্র সাজাহান ও ইউনুসকে একাধারে মা ও বাবা উভয়ের স্নেহেই লালন পালন করেছেন। বিশেষ করে সাজাহানের প্রতি ছিল তাঁর দুর্বলতা। কারণ সে ছিল আত্মভোলা, সংসার অনভিজ্ঞ ও সরল বালক। বয়সে ছোট হলেও ইউনুসের মধ্যে যে বুদ্ধি ছিল—সাজাহানের মধ্যে তা ছিল না। নবাবী চাল তিনি বুঝতেন না। গরীব প্রজাদের দুঃখে তিনি বিগলিত হয়ে যেতেন। তাদের পক্ষ নিয়ে বালক সাজাহান পিতার দরবারে আর্জি পেশ করতেন। সন্তানের প্রতি স্নেহ পরবশ হয়ে নবাব ফের্দৌসী বালকের মনোরঞ্জনেব জন্য অনেক প্রজার খাজনা ছাড় দিয়েছেন বা অনেক প্রজার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন।

তাই পিতার মৃত্যুর পর হতে সাজাহান এ পৃথিবীতে যেন বড়ই একা হয়ে পড়লেন। তাঁর মনের মানুষ, তাঁর সমব্যাথী, তাঁর অতি প্রিয় আপন জন চলে যাওয়ায় তিনি যেন নিজেকে রিক্ত মনে করলেন।

ইউনুস যদিও তাঁর থেকে বছর খানেকের ছোট—কিন্তু পড়াশুনা ও পৃথিবীর নানা জ্ঞানের দিকেই ছিল তাঁব ঝোঁক। তাই পিতৃ বিয়োগের শোকে সাজাহান যতটা মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন—ইউনুস তা হননি। পিতার অভাব তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন—কিন্তু এটাও তিনি জানতেন দেহ ক্ষয়িষ্ণু, মৃত্যু ধ্রুব। তা ছাড়া সাজাহানের মত তিনি নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে রাখেননি পিতৃস্নেহের অন্তরালে। পরন্তু দিলদরিয়া ইউনুসের "বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

তাই সাজাহান যখন পিতার অভাবে চারদিক শূণ্য অনুভব করেছিলেন, ইউনুস তখন নিজেকে আত্মীয় বন্ধু মহলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই সাজাহানের যে অভাব কালপ্রসারী হয়ে পড়েছিল—ইউনুসের সে বেদনা ভুলতে সময় খুব বেশী লাগেনি।

সাজাহান সবার চোখের আড়ালে থেকে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন তাঁর তুলি ও রঙের মধ্যে। শিল্পী জীবনের প্রেরণা তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর পিতা। তাই পড়াশুনা সাজাহান বেশী করেননি—

তাঁর রং ও তুলিই তাঁকে তুচ্ছ সাংসারিক সব পঙ্কিলতা, সব কর্দমতা হতে সরিয়ে রেখেছিলেন।

পিতৃ বিয়োগের পর হতে অভিমানী সাজাহান যেন নিজেকে আরও গুটিয়ে নিলেন। তাঁর অন্তরের নিভৃত কথা কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। নবাবী হাল-চাল তাঁর তেমন ভাল লাগতো না। দশের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইতেন। কিন্তু নবাবী চালের কঠিন শৃঙ্খল তাঁকে উত্যক্ত করে তুলতো। সবার সঙ্গে মেপে মিশতে হবে—মেপে কথা বলতে হবে—সমবেদনা জানানো চলবে না গরীবদের প্রতি। এ হয়েছিল তাঁর পক্ষে অসহনীয় দুঃখ। পিতার অবর্তমানে তাঁর কোমল মনকে বুঝবার আর কেউ ছিল না সংসারে। তাই তিনি দুনিয়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক ঝেড়ে ফেলে তাঁর শিল্পী আত্মভোলা মনকে ভরিয়ে রেখেছিলেন তাঁর শিল্পের মধ্যে। এবং প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য কাশ্মীরে চলে গেলেন প্রকৃতির কোলে বসে দুনিয়ার সব কিছু ভুলে থাকতে।

রবীন সেন প্রশ্ন করলো, তারপর কি হলো?

আর এক পেগ ঢেলে মদের গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে মিঃ সোম বললেন, আজ সাজাহান পর্ব শেষ করবো।

গোলাম আলী ডালিমকুমারীর সাদি পাকা করে ফেললো। ডালিমকুমারী একদিন মিঞা ভাইয়ের অবর্তমানে পাহাড়ের কোলে সাজাহানের সুন্দর বাংলোতে ছুটে এসেছিল। এই বাংলোটি নবাব ফর্দৌসীর পৈত্রিক আমলের বাড়ি। তাই তেমনি ভাবে সাজানো গুছানো রয়েছে। বহু দিনের পুরনো কাশ্মীরী ভৃত্য সাদেক আলী একমাত্র প্রভুর দেখাশোনা করে। সাদেক আলীরা পুরুষানুক্রমে এই নবাব পরিবারের বান্দা। এই আপনভোলা প্রভুর উপর ছিল তার খুব মমতা।

ক্রমেই সাজাহান যখন নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারছিলেন, তখন থেকে গোলাম আলীর অবর্তমানে তাদের ডেরায় যাওয়া বন্ধ করেছিলেন সাজাহান। ডালিমকুমারীই একদিন মিঞা ভাইয়ের অবর্তমানে সাজাহানের কাছে গেল।

তবে কি সাজাহান অপর দশজনের মত ডালিমকুমারীর সঙ্গে ছলনা করেছিলেন ?

—না, তা নয়। তাঁর প্রেমের মধ্যে কোন রকম ফাঁকি ছিল না। কিন্তু ডালিমকুমারীকে কেবল সাদি করলেই তো হতো না। তাকে তাঁর বংশগত মর্যাদার সঙ্গে ভরণপোষণের যোগ্যতা তাঁর নেই। মাসহারা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর নিজেরই দিন চলছিল না।

—কিন্তু আইনতঃ তো কেউ তাঁকে তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

—সে তো আপনারাও জানেন, আমিও জানি। তবে যিনি সরল, সোজা, আইনের কুট জালে কখনই পা দেবেন না—তাঁকে বুদ্ধিমান মাত্রই বঞ্চিত করেন।

—কে তাঁকে এমন ভাবে বঞ্চিত করেছিলেন ?

—নবাব ফর্দৌসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন স্ত্রীর পরামর্শে মেজ ভাইকে বঞ্চিত করেছিলেন।

—ছোট ভাই ইউনুস এর প্রতিবাদ করেননি ?

—তিনি তখন লণ্ডনে অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করছেন। সুতরাং দাদা তাঁর মোটা খরচ মাসে পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু অতি ভাল মানুষ সাজাহানকে করেছেন বঞ্চিত। তিনি এসব কিছুই জানতেন না।

—তখনও কি তাঁদের স্টেট ছিল ?

—না, তখন স্টেট সরকার অধিগ্রহণ করেছে। সামান্য কিছু জমি ও নানা দেশে বসত বাড়িগুলি অবশিষ্ট রেখেছিল। সরকার থেকে সামান্য কিছু মাসহারা পাওয়া যেতো।

ডালিমকুমারী সাজাহানকে দেখেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললো, সাহেব, মিঞা ভাই যে আমার সাদি ঠিক করেছে। আপনি যে আমাকে সাদি করবেন বলেছিলেন—তার কি হলো ? তবে কি মিঞা ভাইয়ের কথাই সত্যি ? আপনি আমার সঙ্গে খেলা করেছেন এদ্দিন ! স্রেফ ধোঁকা দিয়েছেন ?

ডালিমকুমারীর অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলে ধরে সাজাহান রুদ্ধ স্বরে

বলেছিলেন, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো—এই মুখে কি প্রবঞ্চনার কোন চিহ্ন পাচ্ছ? আমি বুঝতে পারছি তোমার প্রতি তোমার মিঞা ভাই অন্যায় করছে। কিন্তু তার এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার মত অর্থবল আমার নেই। আমি জানি এসব অন্যায় মিঞা ভাই করতে পারেন না। তাঁকে দিয়ে করাচ্ছেন ভাবী। তুমি আমাকে ভুল বুঝ না ডালিম। কিছু একটা ব্যবস্থা করে তোমাকে কি করে কাছে আনা সম্ভব—সেই চিন্তাতেই ছিলাম এদ্দিন। সত্যি আমি তোমাকে ফাঁকি দিইনি বা ফাঁকি দেবার অভিরুচিও আমার নেই। কালকের মধ্যে আমার সিদ্ধান্ত তুমি জানতে পারবে। আমাকে তুমি অন্য আর দশজন ধনী পুত্রের মত ভেবো না।

সরলা ডালিমকুমারী অশ্রু মুছে ফিরে গিয়েছিল অনেক আশা নিয়ে। পরদিন ডালিমকুমারী খবর পেয়েছিল তার মিঞা ভাইয়ের কাছে—সাজাহান বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি যে প্রবঞ্চক নন—হয়ত সেটা প্রমাণ করবার জন্যই তিনি এমন নির্মম পরিণতি স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন।

—শুধু কি তাই? সাজাহানের প্রেমের তীব্র দহনজ্বালা কি এই পরিণতির জন্য দায়ী নয়?

—সে তো নিশ্চয়ই। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে ব্যর্থ হলো। তাঁর প্রেয়সী অন্য লোকের অঙ্কশায়িনী হচ্ছে—এ নির্মম সত্য তাঁকে এ মর্মন্তুদ পথের নিশানা দিয়েছে।

রবীন জিজ্ঞেস করলো—ডালিমকুমারীর কি বিয়ে হয়েছিল বন্দে আলীর সঙ্গে?

—না। সাজাহানের মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি বেশ কিছুদিন। পরে একদিন তার গলিতদেহ পাওয়া গেল একটা খাদের মধ্যে। হয়ত সে নিকটবর্তী কোন পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রথীন বললো—রাত ১১টা। আজ আমরা আসি। আর একদিন আসবো।

—দোহাই আপনাদের, আমাকে অনিশ্চিতের মধ্যে ফেলে যাবেন না। আরেকদিন নয়। কালই আপনারা দয়া করে এমনি সময় আসুন। আমারও বোধ হয় শেষের দিন এগিয়ে আসছে। যাবার আগে তাই উজাড় করে দিয়ে যেতে চাই আমার 'ঠাকুরমার ঝুলি।'

—বেশ, তাই হবে। বলে উভয়ে হাত তুলে নমস্কার করে নিজেদের কার-এ এসে বসলো।

রথীন বললো—রবীন কেবল নবাব পরিবারের গল্পই নয়—মিঃ সোমের জীবনেও কোথায় যেন মিসস্ট্রি আছে। তাই তিনি এমন ভাবে রোজ বোতল বোতল হুইস্কি গিলছেন।

রবীন আনমনা ভাবে সাজাহান ও ডালিমকুমারীর কথা ভাবছিলো, রথীনের ডাকে যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বললো, রহস্যে ভরা সবাই। মিঃ সোমের নাতনিটিও স্বাভাবিক নয়, মনে হয় তার জীবনেও কোথায় লুকিয়ে আছে রহস্যের জাল।

—ডিটেকটিভের মত তুই যে ভাবে প্রতিটি চরিত্র পরাতে পরাতে চিরে দেখিস্—আমি কিন্তু অত গভীরে যেতে পারি না। যা হোক্ তামাম শোধ হ'তে আমাদের কনক্লুশন টানতে হবে।

গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

৩

রথীন ও রবীন পরদিন আবার মিঃ সোমের বাড়ি আসলো। এবারও তাঁর নাতনি রমা এসে চা ও খাবারের প্লেট তাঁদের সামনে সাজিয়ে দিয়ে পূর্ব দিনের মত বেড়াতে বের হলো। মিঃ সোমও তাঁর হুইস্কির বোতল নিয়ে বসে বললেন—দেখুন, আপনারা হয়তো আমার উপর বিরক্ত হচ্ছেন—রোজ আপনাদের এভাবে ডেকে এনে কোন এক অখ্যাত নবাব পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের কোন সম্পর্কই নেই, তাঁদের কাহিনী শোনাবার জন্য। রবীনবাবু লেখক, হয়ত এই

দুই নবাব পরিবারের কাহিনী হতে তাঁর লেখার রসদ পাবেন—তাই এই কষ্ট দিচ্ছি। তা ছাড়া আমার পরিচিত এই দুই নবাবের কাহিনীর এসব রোমাঞ্চকর গল্প লিপিবদ্ধ হলে আমিও খুশী হবো, এঁদের সুখ-দুঃখে ভরা জীবন হতে পাঠকরাও পাবে কিছু অভিজ্ঞতা।

রবীন উত্তর দিলো, আমরা কিছু মাত্র বিরক্ত হচ্ছি না। বরং বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি এসব কাহিনী হতে।

—আজ ছোট নবাবপুত্র ইউনুস সম্বন্ধে আপনাদের বলবো। তিনি নবাব ফর্দৌসীর যোগ্য পুত্র ছিলেন। দাদাদের মত নবাব পরিবারের বিলাস ব্যসনে ও আরামে আনন্দে তিনি নিজেকে ডুবিয়ে দেননি। কেবলমাত্র অক্সফোর্ড হতে পলিটিক্যাল সায়েন্সেই তিনি এম. এ. ডিগ্রী নিয়ে ফেরেননি, তিনি রাজনীতিও বেশ রপ্ত করেছিলেন। বৃটিশ আমলে তিনি বার কয়েক তখনকার লেজিসলেটিভ এসেম্বলীতে এম. এল এ. ও হয়েছিলেন। তিনি নানা রকম ব্যবসার সঙ্গেও সংলিষ্ট ছিলেন।

—তিনি কাকে বিয়ে করেছিলেন?

—যদিও সবাই জানেন তিনি অকৃতদার ছিলেন। তবে লণ্ডন হতে ফিরে তাঁর নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থার পর তিনি তাঁর প্রেমিকা মার্গারেট ইস্টারকে লণ্ডন হতে আনিয়েছিলেন। মার্গারেটকে স্বধর্মে ধর্মান্তরিত করতে না পারলে তিনি তাঁকে বিয়ে করতে পারেন না।

—কেন তিনি তো রেজিস্ট্রী বিয়ে করতে পারতেন।

—হয়ত তা পারতেন। কিন্তু যে কারণে সাজাহান ডালিমকুমারীকে বিয়ে করতে পারলেন না, মার্গারেট সম্বন্ধে সেই একই রকম বাধা। অর্থাৎ তাঁর ঔরসজাত সন্তানরা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতো না। বুদ্ধিমান ইউনুস তাই মার্গারেটকে এখানে আনিয়ে ভেবেছিলেন কোন রকমে কলমা পড়িয়ে তাকে বিয়ে করবেন। কিন্তু শিক্ষিতা পাশ্চাত্য নারী কেন ইউনুসের জন্য ধর্ম ত্যাগ করতে যাবেন? তাই তিনি ফিরে গেলেন স্বদেশে। আর ইউনুস নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন রাজনীতি ও তাঁর ব্যবসার মধ্যে

রথীন প্রশ্ন করলো—ইউনুসের অপমৃত্যুর কারণ কি ?

মিঃ সোম খানিকটা মদ ঢেলে হেসে বললেন—ধীরে বন্ধু ধীরে। এত তাড়াতাড়ি কি যবনিকা টানা যায় ? সবে তো উষাকাল। পারিবারিক সন্ধ্যা না হলে যবনিকা টানবো কি করে ?

মিঃ সোম আরম্ভ করলেন তাঁর গল্প। এবার শুনুন, নবাব সাহেবের একমাত্র দুহিতা সুরাইয়ার কথা। সুরাইয়াকে নবাব সাহেব বাড়িতেই 'গভরনেস রেখে ভাল ইংলিশ লিখতে পড়তে ও বলতে শিখিয়েছিলেন। সুরাইয়া আদরের নবাব-দুহিতা হলেও তাঁকে নবাব জাহাঙ্গীরের বেগম সাহেবা সুগৃহিণী রূপে গড়ে তুলেছিলেন। 'রান্না-বান্না,' নার্সিং, আদব-কায়দায় পুরাদস্তুর ওস্তাদ। পাশ্চাত্য আদব কায়দাও তাঁকে শেখানো হয়েছিল। এক কথায় যাকে বলে সব রকমে একমপ্লিস্‌ড্‌ মেয়ে। কিন্তু গোঁড়ামীও তেমনি ছিল। অর্থাৎ বোরখা ছাড়া তিনি তাঁর নিজস্ব গাড়িতেও চলাফেরা করতেন না। বোরখা পরেও নিজের কারে দু' পাশে ও সামনে পর্দা খাটানো—যাতে ড্রাইভার বা অন্য কেউ তাঁকে দেখতে না পারে। কারো সামনে তাঁকে বের হতে দেওয়া হোতো না। কোন স্কুল কলেজেও তাঁকে পড়তে দেওয়া হয়নি। যা কিছু শিক্ষা তাঁর ঘরে বসে। কিন্তু সেই শিক্ষা ছিল নিখুঁত। ডিগ্রী ছিল না যদিও, তবু তাঁর জ্ঞানের অভাব ছিল না। সুরাইয়া দেখতেও সুন্দরী। কিন্তু কনজারভেটিভ পরিবারে জন্মেও তিনি পাশ্চাত্য আদব-কায়দা এমন কি ইংলিশে কনভারসেশনে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন।

রথীন জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর বিয়ে হলো কার সঙ্গে ?

—ঢাকার নবাব জাহাঙ্গীরের একমাত্র পুত্র নবাব সুরাবর্দির সঙ্গে। নবাব জাহাঙ্গীরের তিনটি কন্যা ও ঐ একমাত্র পুত্র ছিল। এই নবাব সুরাবর্দির বংশেরও একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।

—সুরাবর্দির বংশেও ইতিহাস ?

—হ্যাঁ। ওঁদের স্টেটের নাম কমলাপুর। নবাব সুরাবর্দির পূর্ব-পুরুষের কোন এক নবাব এক হিন্দু ব্রাহ্মণ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। নবাবের পাশের বাড়িতে একটি গরীব ব্রাহ্মণ বাস করতো। একদিন

তার ছোট মেয়ে কমলা নবাবের বাড়ির বাগানে খেলা করতে আসে। তৃষ্ণার্ত হয়ে সে নবাবের বাড়িতে জল পান করেছিল। এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের হিন্দুরা কমলার বাবাকে জাত যাওয়ার অপবাদে একঘরে করবার হুমকী দিলো। গরীব ব্রাহ্মণ সমাজ রক্ষার অজুহাতে কমলাকে তার বাড়ির বার করে দিলো। সরলা অবোধ বালিকা কমলা মুসলমানের বাড়িতে জল খাবার অপরাধে এত অত্যাচার সহ্য করেছিল যে তার সুন্দর দুধে-আলতা রং-এ কালশিরা পড়ে গিয়েছিল। বেচারি অনাহারে সারাদিন নবাবের বাগানে বসে কেঁদে দিন কাটিয়েছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেল। কমলা ভয়ে ভয়ে পিতার বাড়িতে প্রবেশ করতে গেল। ধর্মের ভয়ে জাতের ভয়ে কমলার বাবা বালিকা কমলাকে গৃহে প্রবেশ করতে দিলো না। কমলা অন্ধকারের ভয়ে নবাববাড়ির আঙিনায় বসে কাঁদতে থাকে। খবরটা নবাবকে জানানো হলো। তিনি ব্রাহ্মণকে ডেকে বালিকার প্রতি এরূপ নির্যাতনের কারণ কি জানতে চান।

গরীব প্রজা ভয়ে ভয়ে নবাব সাহেবকে তাঁর দুঃখের কথা জানালেন। কমলাকে গৃহে স্থান দিলে তার জাত যাবে। সমাজ তাকে একঘরে করবে। তার অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হবে না। ক্রিয়াকর্মে কেউ তাকে ডাকবে না, বা তার বাড়িতে আসবে না। তার যজমানী ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে গরীব ব্রাহ্মণকে না খেয়ে মরতে হবে। তার চেয়ে বরং কমলা মা আমার মরে গেছে বলে মনে করে বাড়ির অন্যান্যদের বাঁচাতে হবে।

নবাব প্রশ্ন করলেন—কিন্তু এই বালিকার গতি কি হবে?

—নবাব সাহেব, আমাদের হিন্দু ধর্মের কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার যুপকাষ্ঠে যেমন হাজার হাজার কমলা মা বিপথগামী হয়েছে, ধর্মান্তরিত হয়েছে—তেমনি কিছু আছে এই হতভাগীর অদৃষ্টে।

নবাব বললেন—অবোধ শিশু তৃষ্ণার্ত হয়ে সামান্য একটু জল পান করেছে—অন্য কিছু নয়—এজন্য ছিন্ন বস্ত্রের মত আপনি তাকে ত্যাগ করবেন? স্নেহ মায়া মমতা বোধ কিছুই আপনার মধ্যে নেই?

—সবই আছে নবাব সাহেব। কিন্তু পেটের দায়ে ধর্মের কাছে সেই সব বলি দিতে হয়েছে।

তখন নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আমার প্রাসাদে এক গণ্ডুষ জল পান করার জন্য কমলার যখন এত বড় শাস্তি হচ্ছে, তখন আমিই ওকে গ্রহণ করবো। অন্য কোন ভাবে এই নিষ্পাপ সরলা বালিকাকে বিপথগামী হতে দেবো না। এতে কি আপনার আপত্তি আছে ?

—এ আমার সৌভাগ্য।

—সৌভাগ্য কিনা জানি না। তবে কমলার পিতৃত্বের দাবিতে ভবিষ্যতে আপনি কখনও আমার থেকে কোন রকম সুবিধার প্রত্যাশা করবেন না! অপর দশজন প্রজার মত আপনিও অন্যতম জানবেন। বরং আপনার এই নিষ্ঠুরতার জন্য আপনার কোন অপরাধ কখনও আমি মার্জনা করবো না। আরও একটা কথা জেনে যান—আপনার যে হিন্দু সমাজ অহেতুক এই সরলা অবলা নিরপরাধী বালিকাকে তাদের সমাজের গুরুদণ্ড দিলেন—তাদের বাস করতে হবে কমলারই নামানুসারে আমার স্টেটের নব নামকরণ "কমলাপুর"। আজ হতে আমার স্টেটের নাম বদলে 'কমলাপুর' করা হলো।

—উনি কি করলেন কমলাকে নিয়ে ? তাকে কি রক্ষিতা বা দাসী করে রাখলেন ?

—না-না, নবাব সাহেব কমলাকে বিয়ে করে পুরোপুরি বেগমের সম্মান দিয়েছিলেন। কমলা বেগমকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। শুনেছি তিনি অপুর্ব সুন্দরী ছিলেন। সত্যি তিনি কমলা। নবাবের গৃহে আসার পরে তাঁর ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। তাই নবাবও কমলার পর অন্য কোন মেয়েকে আর বিয়ে করেননি। শুধু তাই নয়, নবাব সাহেব কমলার জন্য আরও অনেক কিছু করেছিলেন।

—কি আবার করলেন ? প্রশ্ন করে রবীন

—নবাব সাহেব বুড়ি গঙ্গার তীরে একটা সুন্দর কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। এই মন্দিরের খরচ তাঁর রাজকোষ হতে দেওয়া হতো। তবে একটা নিয়ম ছিল, প্রতিদিন প্রথম পূজার

ডালা যাবে নবাব বাড়ি হতে। সর্ব প্রথম নবাবের প্রাসাদ হতে যে অর্ঘ্য আসে—তা দিয়ে পূজা আরম্ভ হতো। তারপর অন্যান্যদের পূজা নেওয়া হতো। শুনেছি কমলা বেগম স্নানান্তে নিজের হাতে পূজার নৈবেদ্য ইত্যাদি সাজিয়ে পাঠিয়ে দিতেন।

—সেই প্রথা কি আজও আছে? নাকি কমলার মৃত্যুর পর তা লোপ পেয়েছে?

—না, বংশানুক্রমে তা প্রচলিত আছে। এভাবে সমাজের দুর্জন ব্রাহ্মণদের বা মোড়লদের শাস্তি দেওয়া হলো। নবাবের প্রজা এরা। ঘোরতর একটা অন্যায় তারা করেছিল কমলাকে ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে, নতুবা গরীব ব্রাহ্মণকে একঘরে করবার হুমকী দিয়ে। যদিও কমলা অন্য কোন মুসলীমের বাড়ি হতে নয়—স্বয়ং নবাব বাড়ি হতে জল পান করেছিল। এর পরে নবাবের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তাঁর দেওয়া পূজা দিতে দেবো না—এমন কথা উচ্চারণ করতে এই সব ব্রাহ্মণ সাহস পায়নি। মনে মনে হয়ত তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল—কিন্তু জান-প্রাণের ভয়ে কিছু বলবার সাহস ছিল না। কারণ শুনেছি, এই নবাব যেমন কুসুমের মত কোমল ছিলেন, তেমনি বজ্রের মত কঠোর ছিলেন। তাই কোন অছিলায় তাঁকে অপমান করতে তিনি এই সব দুর্বৃত্তদের দেবেন না—তা তারা জানতো।

—কেন, তারা কি ইতিপূর্বে তাঁর কঠোরতার কোন প্রমাণ পেয়েছিলেন?

—নিশ্চয়ই। শুনেছি এই রকম সামান্য কারণে হিন্দু মেয়েদের ধর্মচ্যুত করে এই সব পাষণ্ড ব্রাহ্মণরা সে সব অবলা নারীদের বিপথগামী করে তাদের ভোগ করতো। এমন সব ঘটনা নবাবের গোচরে গেলেই—তিনি তাদের তাঁর এতেমখানায় এনে তাঁদের ভবিষ্যৎ গড়ে দিতেন। অর্থাৎ তিনি তাদের মুসলীম ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিতেন। তিনি তাদের শিক্ষিতা করবার জন্য পড়াশুনা, সেলাই ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর তাদের সম্মতি নিয়েই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন।

রথীন বললো—নবাব সাহেবকে বেশ বুদ্ধিমান বলতে হয়। তিনি অনুকম্পার আবরণে সমাজ-পরিত্যক্ত হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরিত করতেন।

মিঃ সোম একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন—আপনারা শিক্ষিত ইয়াং ম্যান। আপনারা কি একটি মেয়ের ভদ্র জীবন অপেক্ষা তার পতিতাবৃত্তিকে শ্রেয় মনে করেন? হিন্দুদের এই মেণ্টালিটির জন্যই তো শত শত হিন্দুকে মুসলীম ধর্মে বা খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করবার সুযোগ ঘটেছে। সব নারীই চায় যে কোন সমাজে বাস করে সে স্ত্রী, জননী, কন্যা বা বধূর সম্মান পায়। ঘৃণ্য লজ্জাষ্কর পতিতা-বৃত্তিতে কোন নারীই আগ্রহান্বিত নয়! গত্যন্তর না থাকাতেই তারা বিপথগামী হয়ে থাকে।

রথীন একটু বিব্রত বোধ করে বললো, না, না, আমি কখনও মেয়েদের অমন নোংরা জীবন-যাপনের পক্ষপাতী নই। তবে কিনা অতগুলি মেয়ে মুসলীম ধর্মে চলে গেল।

—এর জন্য কে দায়ী বলুন মিঃ রায়? বরং আমি তো বলবো নবাব সাহেব এইসব অবলা নিষ্পাপ, সরলা বালিকাদের বাঁচিয়েছেন—বিশেষ কোনও একটি ধর্মে বিশেষ একটি সম্মানের স্থান দিয়ে।

রথীন উত্তর দিলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ সোম। আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজই হিন্দুদের মুসলীম ধর্ম বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। শুনেছি পূর্ব বঙ্গের শতকরা আশি শতাংশ বা ততোধিক ধর্মান্তরিত মুসলীম। হিন্দু ধর্মে নিগৃহীত হয়ে তারা সকলেই ধর্মান্তরিত হয়েছে।

কোন ধর্ম যদি কাউকে ভদ্রভাবে বাস করতে দিতে না চায়, কারণে অকারণে জাত নেবার হুমকী দেয়, তবে কেন তারা সেই ধর্ম আঁকড়িয়ে পড়ে থাকবে?

মিঃ সোম বলেন—আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ সেন। কুকুর বাড়িতে থাকতে পারে, কিন্তু কোন নমঃশূদ্র বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়ালে বা

তার ছায়া কোন ব্রাহ্মণ বা বর্ণ হিন্দুদের গায়ে পড়লে শুনেছি পূর্বে সেই সব নমঃশূদ্রদের নিগ্রহের অন্ত ছিল না।

তিনি এক পেগ ঢেলে নিয়ে বললেন—আমি একা গলা ভেজাবো আর আপনারা এমনি শুকনো মুখে আমার বক্তৃতা শুনে যাবেন, তা কি হয়?

—কেন, আজও তো আমরা এসেই চা ও খাবার খেয়েছি।

—না, না ওটা কিছু নয়। আপনাদের চা বা কফি খেতে যদি আপত্তি থাকে—তবে অন্ততঃ কিছু কোল্ড ড্রিংক নিন। নতুবা আমার একা ড্রিংক করতে ভাল লাগে না। আমার রিকোয়েস্ট—হ্যাব সাম্ কাইণ্ড অফ ড্রিংকস। তারপর তিনি আগন্তুকদের অনুমতির অপেক্ষা না করেই বয়কে ডেকে কোল্ড ড্রিংকের অর্ডার দিলেন। বয় কোল্ড ড্রিংক এনে সার্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সোমও তাঁর ড্রিংকে মুখ দিয়ে এক শিপ্ টেনে বললেন—কি বলছিলাম? নবাব জাহাঙ্গীরের একমাত্র পুত্র নবাব সুরাবর্দির শিক্ষা-দীক্ষা ভাল ভাবেই দেওয়া হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাও দেওয়া হয়েছিল। নবাব সাহেব তাঁর মেয়েদেরও ধনী গৃহে বিয়ে দিয়েছিলেন। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র সুরাবর্দিকে তিনি বিয়ে দিলেন নবাব ফার্দৌসীর আদুরে দুলালী সুরাইয়ার সঙ্গে।

সুরাবর্দিব রাজনীতিতে হাতে খড়ি তাঁর যৌবনের শুরু হতে। তখনকার দিনে নবাব ও শিক্ষিত মুসলীমরা কেউ মুসলীম লীগ কেউ বা কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তাই নবাবের কোষাগার যখন গরীব প্রজাদের খাজনায় পূর্ণ—তখন নিশ্চিন্ত মনে সুরাবর্দি জোর কদমে রাজনীতি করে বেড়াচ্ছিলেন। শ্যালক ইউনুসও সমানে রাজনীতির মঞ্চে লম্ফ ঝম্ফ করে বেড়াচ্ছিলেন।

সুরাইয়ার দুটি পুত্র সন্তান হয়। কিন্তু দুই-ই মৃত। কেউ মৃত জন্মায় কেউ বা জন্মেই মারা যায়। সুরাইয়া যত আধুনিকাই হোন না কেন মনের দিক দিয়ে ছিলেন ভীষণ সংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁর ননদরা সম্পত্তির জন্য এমন কিছু তুক্ তাক্ বা ক্রিয়া কর্ম করেছেন যার জন্য

তাঁর সন্তানরা মারা যাচ্ছে। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি। তাঁরাও একমাত্র পুত্রবধূকে কন্যাতুল্য স্নেহ করতেন বিশেষ করে গুণবতী সুন্দরী পুত্রবধূ। শুধু তাই নয়। পুত্র যখন রাজনীতিতে মেতে রয়েছে, শ্বশুর তখন বিদুষী পুত্রবধূকে জমিদারী পরিচালনার সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন। বোরখার অন্তরালে থেকে শ্বশুরের বর্তমানেই সুরাইয়া সুন্দর ভাবে জমিদারী পরিচালনা করতেন। সুখেই ছিলেন নবাব জাহাঙ্গীর। তাঁর মৃত্যুর পর নবাব সুরাবর্দি স্ত্রী সুরাইয়াকে কলকাতায় নিয়ে আসলেন। পিতৃবিয়োগের পূর্বেই সুরাবর্দির মাতৃ বিয়োগ ঘটেছিল। কলকাতায় নবাব সুরাবর্দির নিত্যি রোজ নানা সাহেব সুবাদের পার্টি দিতে হচ্ছে। বেগম সুরাইয়া না থাকলে তাঁর অসুবিধে হচ্ছে। তাই বেগম সুরাইয়া কলকাতায় চলে এলেন। নবাবের এক বোনের জমিদারী কমলাপুরের কাছেই ছোট ভ্রাতৃবধূ চলে যাওয়ায় তিনি এসে কমলাপুরে থাকতেন। মাঝে মাঝে অন্য বোনেরাও কেউ বা বরিশাল, কেউ বা ময়মনসিং থেকে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। প্রকৃত পক্ষে তখন জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে আমার পূর্ব পুরুষের উপর।

রথীন প্রশ্ন করে, আপনারা কেন দেখাশোনা করতেন? কোন মুসলীম ম্যানেজার ছিল না?

মিঃ সোম উত্তর দিলেন—এই দিক দিয়ে দুই নবাব পরিবারই খুবই সংস্কার মুক্ত ছিলেন। তাঁদের প্রায় সব ম্যানেজার, গোমস্তা, চাকর, বেয়ারা হিন্দু ছিল। একমাত্র তাঁদের রান্নার ও খাবার টেবিলে যে চাকর সার্ভ করতো—তারা দুজনই মুসলীম। পারতপক্ষে তাঁরা মুসলীম চাকর-বাকর রাখতেন না। এঁরা খুবই উদার ছিলেন।

—আপনার পূর্বপুরুষ তো নবাব জাহাঙ্গীরের জমিদারী দেখাশোনা করতেন। তবে নবাব ফর্দৌসীর জমিদারীর খবর আপনারা জানতেন কি করে?

—আমার বাবার কাজেনই ছিলেন নবাব ফর্দৌসীর জমিদারীর

ম্যানেজার। তাই তুই নবাবের জমিদারীর খবর যেমন আমরা জানতাম, তেমনি তাদের অন্তঃপুরের খবরও জানা ছিল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রথীন বললো—রাত ১১টা বাজে। আজ আমরা উঠি। কাল আবার গল্পটার বাকী অংশ শোনা যাবে।

রবীন জিজ্ঞাসা করলো, আপনার গল্পটা শেষ হতে কতদিন লাগবে?

মিঃ সোম বললেন—খুব বেশী দিন লাগবে না। আপনাদের খুব বিবক্তির কারণ হচ্ছি। অবশ্য কাহিনীগুলি শেষ হলে দেখবেন আপনার লিখবার বেশ ভাল একটা রসদ পেয়ে গেছেন।

—তার কিছুটা আঁচ যেন এখনই পাচ্ছি। না-না, আমরা মোটেই বিরক্ত বোধ করছি না। তবে আরও কত দিন এভাবে রোজ বিরক্ত করতে আসতে হবে সেটা জানতে চাইলাম।

—ভুল বলছেন। আমি মোটেই বিরক্ত হই না। ববং আপনাদের সংস্পর্শে নানা বিষয়ে আলোচনা করে সময়টা ভালই কাটে। নতুবা একা একা বসে কেবল পেগের পর পেগ নিঃশেষ করতাম।

রথীনরা নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসলো। পোর্টিকোতে রমার সঙ্গে দেখা। অত রাতে রমাকে ঐভাবে ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রথীন ও রবীন উভয়েই কিছু আশ্চর্য হলো। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত সামনের বাগান। তারই মধ্যে সান বাঁধানো রাস্তায় রথীনের কারটা দাঁড়িয়ে আছে। পোর্টিকোতে রমা যেন এঁদেরই জন্য অপেক্ষা করছিল।

উভয়ের দিকে হাত তুলে বললো, নমস্কার। মুক্তি পেয়েছেন? সত্যি আপনাদের উপর খুব জুলুম হচ্ছে। দাদুর কিন্তু উচিত নয় এভাবে দিনের পর আপনাদের বিরক্ত করা।

রথীন উত্তরে বললো, কই আমরা তো একবারও বলিনি যে আমরা বিরক্ত বোধ করছি।

—সব কথা কি মুখে বলতে হয়? আপনারা কিন্তু দাদুর সাইকয়েট্রিকের কাজ করছেন।

—এমন কথা কেন বলছেন ?

—আজ নয়, পুরো কাহিনী শোনা শেষ হলে পর জানাবো।

—মনে হচ্ছে আপনি যেন আমাদের পুরো কাহিনী শোনাবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব।

—আপনার অনুমান সত্য। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন নয়। কাহিনীটি পুরো শুনলে আপনারাও বুঝতে পারবেন কেন আমি চাইছি যে আপনারা দাদুর কাহিনী শুনুন।

রথীন হেসে বললো, সবই যেন কেমন রহস্যে ঘেরা। ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—রমা হেসে উত্তর দিলো, রহস্যের জাল ছিঁড়ে দিলে তো তার আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যাবে।

—দয়া করে শুধু এইটুকু বলুন—যে সব কাহিনী আমরা শুনছি তার কত পার্সেণ্ট সত্য ? অথবা আমরা আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে কোন মাতালের প্রলাপ শুনছি।

রমার মুখে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। মুখ যেন তার ব্যথায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে যেন আঘাত পেয়ে বললো—দাদু অত্যধিক ড্রিংক করলেও, তিনি কখনও মাতাল হন না। তিনি যা কিছু শোনাচ্ছেন সবই সত্য ঘটনা।

রথীন বললো—আপনি তো শুনছেন না। উনি কি বলছেন আপনি তা জানবেন কি করে ?

রমা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলো, জানি উনি দুই নবাব পরিবারের কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছেন—এবং যার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা তিনি নিজে অথবা তাঁর নিকট আত্মীয়, উনি তাঁর জীবনের প্রান্তে এসে এমন কাউকে খুঁজছিলেন—যিনি এই সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখেন। আপনাদেরই হয়ত উনি যোগ্য মনে করেছেন।

রবীন উত্তর দিলো—আপনি আমার বন্ধুর কথায় কিছু মনে করবেন না। আমি কিন্তু এসব কাহিনী শুনে উপকৃত হচ্ছি। এজন্য আমি আপনার দাদুর কাছে কৃতজ্ঞ। তবে আমার বন্ধু মেটিরিয়েলিস্ট।

তাই এসব গল্প উপন্যাসে তার খুব একটা ইনটারেস্ট নেই। আমিই রোজ ওকে টেনে আনি। আমরা দুই বন্ধু ঠিক বিপরীত প্রকৃতির। আমি বিচরণ করি কল্পনালোকে। আর রথীন হচ্ছে পুরা দস্তুর প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। বন্ধুর হয়ে তাই আমি আপনার থেকে মাপ চাইছি।

রমা গম্ভীর মুখে উত্তর দিলো—আপনার মাপ চাইবার প্রয়োজন নেই। তবে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ দাদুর মনের বোঝা হাল্কা করতে না পারলে, তিনি হয়ত পাগল হয়ে যেতেন এই বয়সে।

রথীন বললো—আপনি তো কখনও ঐ আসরে বসেন না। আসুন না আপনিও। তবে হয়ত আমাদের আড্ডাটা আরও ভাল জমবে।

—মাপ করবেন, আপাততঃ সম্ভব নয়। দাদুর কাছে শুনেছেন তো, আমি শীগ্‌গির ফরেনে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। তাই আপনাদের সঙ্গসুখে আমি বঞ্চিত হচ্ছি। আশাকরি আমার দেশ ছাড়বার পূর্বেই আপনাদের গল্প শেষ হবে। যাক, আপনাদের আর বেশীক্ষণ আটকে রাখবো না—বলে হাত তুলে নমস্কার করে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল রমা।

৪

পরের দিন মিস্টার সোমের বাড়ির উদ্দেশ্যে আসতে আসতে পথে রথীন বললো, দ্যাখ রবীন, আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, রোজ রোজ বোকার মত এতটা সময় এই বৃদ্ধ মাতালের জন্য ব্যয় করা আমাদের সঙ্গত হচ্ছে কিনা। ওঁনার নাতনিটিও যেন ক্রমেই আরও বেশী রহস্যময়ী হয়ে উঠছে।

রবীন উত্তর দিলো, তুই এখনই এত অধৈর্য হচ্ছিস কেন? হয়তো কয়েক দিনের মধ্যে দুই নবাব পরিবারের কাহিনী শেষ হয়ে যাবে।

—আমারও কিছুটা স্বার্থ আছে এই গল্প শুনবার।

বিস্মিত হয়ে রবীন জিজ্ঞাসু হয়ে প্রশ্ন করলো, তোর কি স্বার্থ?

—ভুতুড়ে বাড়ি কিনা—ইউনুসের ঐ বাড়ি, সেটা আমার জানবার প্রয়োজন।

—এ যুগে জন্মেও এসব আজে-বাজে কথা তুই বিশ্বাস করিস?

—বিশ্বাস কি সাধে করি? অনেকটা দায়ে পড়েই করতে হয়। কলকাতা শহরে কত ভাল ভাল বাড়ি হেস্টিং হাউসে, এমন কি হাই-কোর্ট বিল্ডিংএ-ও অনেক ভূতের আনাগোনা আছে শোনা যায়। যাক্, জেনে শুনে ঐ ধরনের কোন বাড়ি জলের দামে হলেও কিন্তু আমি কিনতে রাজি নই। কেউ আমাকে উপহার দিলেও আমি তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

রবীন হেসে বললো—তুই আচ্ছা এক বোকা। কোথাও কিছু নেই তুই ভূতের ভয়ে মরছিস! চল, আগে শুনে আসি কি ব্যাপার। নিত্যি রোজ লণ্ডন, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মানী ঘুরে বেড়াস। এদিকে মনটা দেখছি তোর সেই চিরন্তন কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

মিঃ সোমের বাড়ি এসে পৌঁছোতে অন্যান্য দিনের মত তাদের সাদরে ভেতরে নিয়ে বসানো হলো। অন্যান্য সব কিছু পূর্ব দিনের মতই ব্যবস্থা। কেবল একটি মাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল। নাতনি রমার পরিবর্তে সেদিন বয়ই অতিথিদের জন্য চা ও খাদ্যসামগ্রী এনে টেবিলে রাখলো।

রথীন আজ তীব্র প্রতিবাদ করে জানালো—এ হয় না মিঃ সোম। আমরা রোজ আপনার বাসায় এসে একপ্রস্থ করে খাবার খেতে পারি না। আফটার অল উই আর নট এ চাইল্ড।

—মিঃ রায়, আপনি এ ব্যাপারটাকে এত সিরিয়াসলি নিলেন কেন? আমরা বাঙ্গালী। আতিথেয়তা তো আমাদের সামাজিক একটা রীতি।

—কথাটা অতি সত্য। কিন্তু এটা তো উভয় পক্ষেই হতে পারে। বেশ তো, কাল থেকে আপনার এই আসর আমার বাসায়

বসুক। এক তরফা কিছু বেশী দিন শোভনীয়ও নয় বা সহনীয়ও নয়।

—মিঃ সোম বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, আমি কি রোজ আপনাদের এখানে টেনে এনে আপনাদের উপর উপদ্রব করছি?

—না, তা নয়। তবে এক তরফা রোজ এই চা পর্বটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

—বৃদ্ধ মিঃ সোম খাণিকক্ষণ মৌন থেকে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে বললেন, আজ যদি আমার নাতিরা বেঁচে থাকতো তবে তারা আপনাদের বয়সীই হতো। আমার পাকা পোক্ত শরীরটাকে দেখে হয়ত অনুমান করতে পারছেন না। আমি বুঝতে পারছি মিঃ রায়, আপনার মত একজন কোটিপতি বিজনেস্ ম্যাগ্নেটের আমার মত প্রাক্তন নবাবদের গরিব ম্যানেজারের বাড়ি আসতে ডেলিকেসী ফিল করছেন। কিন্তু আমার ছিয়ানব্বই বছরের দেহটাকে যদি টেনে আপনার প্রাসাদে নিয়ে যেতে পারতাম, তবে আমিই বেশী খুশী হতাম। কিন্তু তা যে হবার নয় মিঃ রায়। আপনারা জানেন না কেন আমি মদে ডুবে থাকি। আপনারা চলে যাবার পর আমার শারীরিক অবস্থা কি হয়—তাও আপনারা জানেন না। কোন যন্ত্রণা ভুলবার জন্যে এত বিষ গিলছি—তাও আপনাদের অজ্ঞাত। আমার মত অতি সাধারণ এক ব্যক্তির বাড়িব সামান্য খাবার স্পর্শ করতে যদি আপনি সঙ্কোচ বোধ করেন তবে অন্ততঃ এক কাপ কফি, চা বা কোল্ড ড্রিংক—অ্যানিথিং ইউ লাইক—ইউ কেন হ্যাব। বেশী দিন আমি আপনাদের আটকে রাখবো না। মোরওভার বোথ্ অব্ ইউ আর ইম্পর্টেণ্ট পারসনস্।

—রবীন বুঝতে পারলো এই বৃদ্ধের জীবনে কোথায় যেন একটা বিরাট ক্ষত আছে। সেই ক্ষত ঢাকবার জন্য বা তার যন্ত্রণা হতে সাময়িক নিষ্কৃতি পাবার জন্যই এই বৃদ্ধের এত মদ্যপান। মানুষের জীবনে কোথায় কি ব্যথা লুকিয়ে আছে, তা কেউ বলতে

বা বুঝতে পারে না। এ জন্য অনেক সময় অজ্ঞাতে লোকে ব্যথার স্থানে আঘাত করে ব্যথাতুরকে অকারণ দুঃখ দেয়।

রবীন পরিবেশটা স্বাভাবিক করে আনবার জন্য বলল, আপনি ভুল বুঝবেন না মিঃ সোম। রথীনরা হল ব্যস্ত মানুষ। এক নাগাড়ে আরব্যোপন্যাস শুনবার মত সময় ও ধৈর্য ওদের নেই। আপনি কিছু মনে করবেন না। রথীন যদিও ধনী পুত্র ও নিজেও ধনী—তবু ধনের অহমিকা তার মধ্যে নেই। তা যদি থাকতো আমার মত গরিব বাল্য বন্ধু সাহিত্যিককে সে এখনও এমন করে জড়িয়ে রাখতে পারতো না। জানেন তো গরিবরা খুবই সেন্টিমেণ্টাল হয়ে থাকে। আমি কোন ক্রমে তার ব্যতিক্রম নই। তবে রথীনের স্বভাব, সুন্দর ব্যবহার, সরলতা ও আন্তরিকতা আমাকে সর্বদা আকৃষ্ট করে। আমার জন্য রথীনের কাজের যাতে ব্যাঘাত না হয়—সেটা আমার দেখা উচিত। কিন্তু আমি স্বার্থপরের মত রোজ তাকে টেনে আনছি। অপরাধটা আমারই।

—বৃদ্ধ মিঃ সোমের ও রবীনের কথায় রথীনের যেন সম্বিৎ ফিরে এলো। সে তার স্বভাব সুন্দর ব্যবহার দিয়ে পরিবেশের দূষিত আবহাওয়া দূর করে নিজেই ট্রে টেনে চা করে এক কাপ মিঃ সোমের হাতে দিয়ে বললো—আজ অন্ততঃ এক কাপ চা আমাদের সঙ্গে খেতে হবে। এবার শুরু করুন আপনার গল্প। রবীন, নে তুই এক কাপ চা—বলে তার হাতেও এক কাপ চা তৈরি করে দিলো।

—পরিবেশকে হাল্কা করতে মিঃ সোম বললেন, যদিও আজ প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমি চা খাচ্ছি না। কিন্তু আজ আপনার অনারেই তা খাবো বলে তিনি এক সিপ্ চা মুখে দিয়ে বললেন—আজ আপনাদের সুরাইয়া ও হুমায়ুনের পরিবারের কিছু কাহিনী শোনাবো। একটা কথা বলে রাখি, নবাব ফের্দৌসীর জীবিতাবস্থায় তার সম্পত্তি অনেকটা তছনছ হয়েছিল। তারপর বৃটিশ রাজত্বের অবসানে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে বাদ বাকী প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। তার থেকে যথেষ্ট ব্যয় হয়েছে তিন পুত্রকে বিলাস সায়রে ডুবিয়ে

রাখতে। বিশেষ করে ইউনুসের উচ্চ শিক্ষা ও বিদেশে পড়ার খরচের জন্য তাঁর অবশিষ্ট সিংহ ভাগ ব্যয় হওয়ায় এবং সুরাইয়াকে নবাব জাহাঙ্গীরের উপযুক্ত পুত্রবধূ রূপে সাজিয়ে পাঠাতে সবই প্রায় নিঃশেষ হয়েছিল। তদুপরি হুমায়ুন ও ইউনুস আমৃত্যু স্টেটের টাকা উড়িয়েছেন যথেষ্ট ভাবে। অবশ্য আইনানুসারে মুসলীম মেয়েদের বিয়েতে শ্বশুর বাড়ি হতেই কোনেকে অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যায়। কন্যা পক্ষের প্রায় কোন খরচই থাকে না। কিন্তু নবাবের আদুরে দুহিতা সুরাইয়াকে তাঁর উপযুক্ত নামে অলঙ্কারে সজ্জিত করে পাঠাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাঁকে ধার করতে হয়েছিল তাঁকে তালুক বন্ধক রেখে পূর্ব বাংলার ভাগ্যকুলের রাজাদের থেকে। এক কথায় ভাগ্যকুলের কাছেই নবাব ফের্দৌসীর ভাগ্য বন্ধক দিতে হয়েছিল—যা কোন দিনও সুদ আসলের অনাদায়ে আর ফেরত আসলো না।

সুরাইয়া ও ইউনুস ছিল নবাব ফের্দৌসীর গর্ব। শিক্ষা, দীক্ষা, আদব কায়দা সব দিক দিয়েই এঁরা দুজন ছিল পিতার অন্তরের মণি। তাই এদের দুজনের জন্য ব্যয় করতে তিনি কার্পণ্য করেননি। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার সময়, তিনি সুরাইয়ার হাত ধরে বলেছিলেন, মা সুরাইয়া, আমার অবর্তমানে তোর দাদার ছেলেমেয়েরা যেন ভেসে না যায় সেটুকু লক্ষ্য রাখিস। ইউনুসের ও শাজাহানের তো সংসারে প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তোর দাদাও সারা জীবন ফুর্তি করে জীবনটা কাটাচ্ছে। তোর ভাবিও তেমন ভাবে সংসারের রাশ টানতে পারবে বলে মনে হয় না।

—নবাব ফের্দৌসী মেয়ের ঘাড়ে কেন সংসারের দায় দায়িত্ব চাপিয়ে গেলেন? সুরাইয়ার নিজস্ব সন্তান তো তখনও হতে পারতো।

উনি জীবিত থাকতেই সুরাইয়ার দুটি সন্তান হয়ে মারা গেছে। শেষের সন্তানটি জন্মাবার সময় ডাক্তার বলেছিলেন তাঁর আর মা হবার সম্ভাবনা নেই। সুরাইয়াকে রক্ষা করতে সন্তানটিকে মেরে

ফেলতে হয়েছিল মাতৃগর্ভেই। বোধ হয় এই জন্যই নবাব ফের্দৌসী কন্যার কাছে এই অনুরোধ করেছিলেন।

—নবাব ফের্দৌসীর পুত্র হুমায়ুনের শ্বশুরকে কেন তিনি এই কথা বলে গেলেন না?

—হুমায়ুনের স্ত্রী খানদানী বংশের মেয়ে। কিন্তু তাঁর বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল ছিল না। তাই তাঁদের উপর নবাব সাহেবের বিশেষ ভরশা ছিল না। তা ছাড়া নিজের মেয়ে ও ছেলের শ্বশুরের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

—সুরাইয়া বেগম কি পিতার অনুরোধ রেখেছিলেন?

—হাঁ, সুরাইয়া বেগম প্রথম হুমায়ুনের বড় মেয়ে তনিমাকে নিজের কাছে এনে লেখাপড়া শেখালেন। লরেটো স্কুল হতে সে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করলো। তার কোচিং এর জন্য বাড়িতে লেডী টিচার রেখেছিলেন। তনিমাকে সেলাই শেখাবার জন্য আরও একজন লেডী টিচার রেখেছিলেন। লরেটো স্কুলে লেখা পড়া করার জন্য সে বেশ স্মার্ট হয়ে উঠেছিল। দেখতে সে সুন্দরী। সুরাইয়া বেগমের ইচ্ছে ছিল তনিমাকে গ্র্যাজুয়েট করিয়ে কোন উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হলো না।

—কেন, এ ব্যাপারে বাদ সাধলেন কে?

—বাদ সাধলেন হুমায়ুনের স্ত্রী সালেহা। তিনি তাঁর মেয়েকে আপন ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

—যদিও মুসলীম ধর্মে এ ধরনের বিয়ে প্রচলিত তবু শিক্ষি পরিবারেও কি এ সব প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়?

—শিক্ষিত খানদানী পরিবারে এ রকম বিয়ে পছন্দ করতো না নবাব ফের্দৌসী বেঁচে থাকলে কখনও এমন ঘটতে পারতো না। হুমায় কখনও কোন ব্যাপারে স্ত্রীর বিরুদ্ধাচারণ করতেন না—তা ভাল ম যাই হোক না কেন? তা ছাড়া সালেহা খানদানী বংশের মেয়ে ব —তবে লেখাপড়া তেমন করেননি। সাংসারিক কূট বুদ্ধিটাই তঁ প্রখর ছিল। নিজের পিতৃকুলের সম্পদ বৃদ্ধিরই এটা একটা কৌশল

যে মেয়েটিকে বাল্যাবস্থা হতে এনে তার পোষাক পরিচ্ছদ, লেখাপড়ার খরচ, এক কথায় যাবতীয় সমস্ত খরচ দিয়েছেন নবাব রাবর্দি, নিজের মেয়ের মত স্নেহে যত্নে বেগম সুরাইয়া যাকে বড় রেছিলেন—তার বিয়েতে তাঁদের মতামত নেওয়া বা ভদ্রতার খাতিরে কবার 'জানাবার প্রয়োজন মনে করলেন না সালেহা বেগম। াপারটা এমন ভাবে সম্পন্ন হলো, যেন উদ্দেশ্য নবাব সুরাবর্দি ও ার স্ত্রীর থেকে তা গোপন রাখা।

—তনিমা তো নবাব সুরাবর্দির কাছে থাকতেন। তবে তাঁদের জ্ঞাতে কি করে এই বিয়ে হলো? এমন লুকোচুরিরই বা কি য়োজন ছিল?

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বেগম সুরাইয়া যখন তনিমাকে তার রেজাল্ট বর হবার পূর্বে তিন মাসের অবসর সময়ে নামা রকম শিক্ষা দিয়ে াকে এক একমপ্লিসড্ লেডী রূপে গড়বেন স্থির করলেন, গান াজনা শেখাবার ব্যবস্থা করলেন, তা ছাড়া উনি নিজে খুব ভাল কমারি রাঁধতে পারতেন; ভাইঝিকে সব রকম রান্নাও শেখাতে ুরু করলেন, এমন সময় হঠাৎ সালেহা বেগম তাঁর ভাইপোর ারফৎ একটা চিঠি পাঠালেন বেগম সুরাইয়ার কাছে।

—চিঠিতে তিনি কি লিখেছিলেন?

—লিখেছিলেন তনিমার তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। সে ছাটবেলার থেকে তোমার কাছেই রয়েছে। এখন তো তার ছুটি। মামার কাছে কয়েক দিনের জন্য বেড়িয়ে যেতে দাও। আমার ভাইপো ফারুককে পাঠালাম। তার সঙ্গেই তাকে পাঠিও।

নবাব সুরাবর্দি ও বেগম সুরাইয়া এই ফারুক ছেলেটিকে খুবই পছন্দ করতেন। সে ছিল এক নম্বরের ৪২০। কোথায় কাকে কি াপ্পা দিয়ে টাকা আদায় করবে, এই ছিল তার কাজ। লেখাপড়াও স তেমন বিশেষ কিছু করেনি। নবাব সুরাবর্দির বাড়িতে সে তার পিসি সালেহা বেগমের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসতো। সেই সময় তার াদব কায়দা ও কথাবার্তাতেই সে তার গুণাগুণ প্রকাশ করেছিল।

তা ছাড়া বাইরে বাইরে সে কি করতো তারও ছিটে ফোটা খবর গোমস্তা, ম্যানেজার, স্টেনো প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁর কানে পৌঁছেছিল।

বড় ভাই-এর স্ত্রীর মনে দুঃখ দিতে চান না বলে বেগম সুরাইয়া যদিও তার সঙ্গে খুব একটা দুর্ব্যবহার করতেন না, তবে খুব একটা আদর যত্নও দেখাতেন না। যেমন বাইরের আগন্তুক এলে তাকে খাবার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল তেমনি। শুধু তাই নয়,—যতক্ষণ ফারুক থাকতো, ততক্ষণ বেগম সুরাইয়া তনিমাকে নানা কাজের অছিলায় অন্দরমহলে আটকে রাখতেন। তিনি চাইতেন না যে সুন্দরী তন্বী তনিমা দুশ্চরিত্র যুবক ফারুকের দৃষ্টিতে পড়ে। অবশ্য তনিমার মা চাইতেন তনিমা এসে তার মামাতো ভাই ফারুকের সঙ্গে আড্ডা দেয়, হাসি তামাসা করে। কিন্তু ধনী ননদকে রাগাতে তিনি সাহস পেতেন না। কারণ তাঁর দৃষ্টি নবাব সুরাবর্দির বিপুল সম্পদের উপর। তিনি চান সন্তান-হীনা ননদকে নিজের সন্তান প্রতিপালনেব দায়িত্ব দিয়ে তাদের প্রতি বেগম সুরাইয়াকে স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে ফেলা। অবশেষে নবাবের সম্পত্তি তাঁরই কাছে চলে আসবে পুত্র কন্যার মাধ্যমে। তিনি শুধু একা নয়, তাঁর পিতৃকূলকে সমৃদ্ধ করবার স্বপ্ন দেখতেন। তাই ফারুককে বার বার নিয়ে আসতেন। যদিও সালেহা বেগম ভাল ভাবেই বুঝতে পারতেন এতে তাঁর ননদ খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। কত দিন বেগম সুরাইয়া তাঁকে বলেছেন—ভাবি, তুমি আমার এখানে যখন আসো, কেন প্রতিবার তোমার ঐ ফাজিল ভাইপো ফারুককে নিয়ে আসো? আমরা মেয়েলি আলাপ আলোচনা করি, তার মধ্যেও এসে সে নাক গলায়, এ আমি মোটেই পছন্দ করি না তুমি যেদিন আসতে চাও, ফোন করে দিও। আমি আমার কা পাঠিয়ে দেবো। তোমাকে এমন একজন বাহন আনবার কোন প্রয়োজনই হয় না।

—সালেহা বেগমের কি কার ছিল না?

—নিশ্চয়ই ছিল। তবে হুমায়ুন সাহেবই বেশীর ভাগ সময় তা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

শুনুন তারপর। সালেহা বেগম হেসে উত্তর দিলেন—সে যে তার সুন্দরী সুরাইয়া ফুপুকে বেশী পছন্দ করে। এখানে আমি আসবো শুনলেই, সে তোমার কাছেঁ আসবার জন্য এক পা তুলে যেন দাঁড়িয়ে থাকে। কি মায়াই তুমি জান? আমার ছেলেমেয়েদের মুখে তো আন্টি ছাড়া কথাই নেই। আমি ওদের জন্মদায়িনী মা। কিন্তু গরিব মা অপেক্ষা ধনী আন্টির প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশী।

—তুমি এ ধরনের কথা বলো না। আমার দাদা কখনও গরিব নন। বাবা যা রেখে গেছেন, তোমরা যদি তার অপচয় না কর, তবে সুখেই কাটিয়ে যেতে পার।

—তারপর কি হলো? বেগম সুরাইয়া কি তনিমাকে ওর সঙ্গে পাঠালেন?

—ঠিক ওর সঙ্গে নয়। কারণ ফারুককে তিনি কখনই বিশ্বাস করতেন না। তাই নবাব বাড়ির মেয়েকে একা উনি ফারুকের সাথে যেতে দিলেন না। নিজেদের কারে একজন ঝি'কে সাথে দিলেন।

—তারপর কি হলো?

—তার কয়েক দিন পর সালেহা বেগমের চিঠি এলো। তনিমার বিয়ের বয়স হয়েছে। তাই আমি ফারুকের সঙ্গে তার আকৃত্ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছি। তোমার দাদারও এই বিয়েতে মত আছে। জানি তোমার সম্মতি পাবো না। তাই এই শুভ কাজে কোন রকম ঝামেলা যাতে না হয়, এজন্য তোমাদের ডাকিনি। তবে তনিমা তোমারই মেয়ে। তার বিয়েতে তুমি উপস্থিত থেকে সব কাজ করবে। এ কাজ তো তোমারই। সময় মত আমি বিয়ের দিন জানাবো।

—নবাব ও বেগমের রি-অ্যাকশন্ এতে কি হলো?

—বেগম দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর কত আশা সুন্দরী শিক্ষিতা তনিমাকে তিনি তাঁর পছন্দ মত কোন নবাব পরিবারের সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। এজন্য তিনি হায়দ্রাবাদ ভূপাল প্রভৃতি নানা নবাব পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। এমন একটা

সুন্দর মেয়েকে এই রকম একটা অকাট মূর্খ—অর্থাৎ নেই যার কলেজীয় শিক্ষা, পেশা যার বাউণ্ডলেপনা, পিসীর হোটেলে বাস অর্থাৎ হুমায়ুনের শ্যালকগুষ্ঠি নবাব ফের্দৌসীর মৃত্যুর পর হুমায়ুনের বাড়িতেই এসে উঠেছিল।

—হুমায়ুন এর প্রতিবাদ করেননি?

—বলেছি তো সংসারে কি হচ্ছে তিনি তার খোঁজ রাখতেন না। স্ত্রী সালেহা বেগম যা করতেন তাই হতো। তিনি কেবল স্ফূর্তি করে বেড়াতেন। সুতরাং শ্বশুর পরিবার যে নবাব ফের্দৌসীর হারামে আস্তানা নিয়ে নবাব সাহেবের অন্ন ধ্বংস করছে, সে দিকে তাঁর খেয়ালই ছিল না।

—ইউনুস সাহেব প্রতিবাদ জানাননি কি?

—লণ্ডন হতে ফিরবার পরই তিনি স্বতন্ত্র বাড়ি করে আলাদা থাকতেন। দাদা ও ভাবির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক তাঁর ছিল না। বরং ছোট বোন সুরাইয়ার কাছে মাঝে মাঝে যেতেন। বোনও আদর যত্ন করে খাওয়াতেন, ভাইকে বিয়ে করতে অনুরোধ করতেন। কিন্তু ইউনুস তখন তাঁর নানা ব্যবসা ও রাজনৈতিক কাজে এত ব্যস্ত যে বিয়ের কথা ভাববার তাঁর সময় ছিল না। বিশেষ করে ভাবি সালেহাকে দেখে এ দেশের মেয়েদের প্রতি তাঁর একটা বিরূপ ভাব জন্মেছিল। তাই বিয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

নবাব সুরাবর্দি কিন্তু গর্ব করে বলতেন—তা বললে শুনবো কেন ব্রাদার? সব মেয়ে কি সমান? আমার মত লাকী কয়জন? তোমার বোনটির মত সুন্দরী ও একম্প্লিস্ড্ মেয়ে হাজারে একটি দুর্লভ। এখানে কেন—তোমাদের লণ্ডনেও দুর্লভ।

ইউনুস দুঃখ করে ছোট বোনকে বলেছিলেন—দেখিস ভাবি যেভাবে তার ভাই এর সংসারকে ঠেলছে, দাদার জীবতাবস্থায় আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি লাটে উঠবে।

—এই ব্যাপারে নবাব সুরাবর্দি শ্যালক হুমায়ুনকে কিছু বলেননি?

—না, তিনি হুমায়ুনকে বা তাঁর স্ত্রীকে কিছু বলেননি, বরং বলে-

ছিলেন বেগম সুরাইয়াকে। বলেছিলেন কেন তুমি অযথা পরের মেয়ের জন্য তোমার এত টাকা নষ্ট করছো বা স্নেহের জালে নিজেকে এমন ভাবে জড়াচ্ছ ? এরা স্বার্থের খাতিরে তোমার ঘাড়ে মেয়েটিকে দিয়েছিল। তনিমাকে তুমি লেখাপড়া শেখালে এখন তিনি তাঁর অপগণ্ড ভাইপোর সঙ্গে মেয়েটাকে ঝুলিয়ে দিলেন। এ বিয়ে রোধ করবার তোমার কোন এক্তিয়ার নেই। ওদের মেয়েকে ওরা জলে ফেলে দিক বা কেটে মেরে ফেলুক তাতে তোমার আমার কিছুই করণীয় নেই, এমন কি আইনের জোরেও নয়। শুধু তোমার নয়, তোমার ছোট ভাইজানের সম্মতি নেওয়াও প্রয়োজন মনে করেননি তোমার ভাবি।

বেগম সুরাইয়া স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি করে জানলে তারা ভাইজানের সম্মতি নেননি ?

নবাব সাহেব উত্তরে বললেন—এই খবরটা পেয়েই আমি তোমার ভাইজানের কাছে ফোন করেছিলাম। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমাকে দাদা বা ভাবি কিছু জানায়নি বা জানানো প্রয়োজনও মনে করেনি। এমনি সব ব্যাপার ঘটবে। এই পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ করেই বাবা ভুল করেছিলেন। তিনি কেবল খানদান দেখে দাদার বিয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে শিক্ষা, অর্থ বা কালচারেরও যে প্রয়োজন তা তিনি বিবেচনা করেননি। তাই এমন ভাবে পূর্ব বাংলার খ্যাতনামা নবাব পরিবারের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে একটা স্কাউণ্ড্রেলের সঙ্গে।

সুরাইয়া বোধ হয় খুব আঘাত পেয়েছে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলো দাদার ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে সে যেন আর না থাকে।

বেগম সুরাইয়া কেঁদে নবাব সুরাবর্দিকে বলেছিলেন—আমি তবে কাকে নিয়ে বাঁচবো ? ওরাই তো আমার মন জুড়ে রয়েছে।

নবাব উত্তর দিলেন—কেন, তুমি আমার কোন ভাগ্নেকে মানুষ কর। সে তোমার নিজের ছেলের মত থাকবে। তা ছাড়া এতে আমার দিদিরাও খুশী হবেন।

বেগম সুরাইয়া বললেন—না, তোমার কোন ভাগ্নে ভাগ্নীকে

আমি আনবো না। ওদের মা'দের দৃষ্টিতেই তো আমার দুটি সন্তানের একটিও বাঁচলো না।

এ তোমার অন্যায় অভিযোগ, একটা ভুল ধারণা, কল্পনা করে দুঃখ পাচ্ছ। আমাদের অদৃষ্ট। তাই এমন হয়েছে। এতে তাঁদের তো কোন হাত ছিল না। তুমি তো থাকতে আমার মা বাবার কাছে। তাঁরা থাকতেন তাঁদেব স্বামী গৃহে। তা ছাড়া বাবা আমার প্রত্যেকটা বোনকেই জমিদার বা ধনী বা নবাব পরিবারে বিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের তো কোন অভাব নেই। আমার দিদিরা কখনও তো তোমাব কলকাতার বাড়ীতে একদিনের জন্যও এসে থাকেন নি। অথচ সে অধিকার তো তাঁদের ছিল। কিন্তু তাঁরা সেই প্রকৃতির মেয়ে নন। উচ্চ শিক্ষা না পেলেও বাবা তাঁদেরও গভর্নেস রেখে সুশিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছেন তুমি তাঁদের আদরের ভ্রাতৃবধূ হলেও তুমি তাঁদেব পছন্দ কর না। তাই তাঁরা তোমার বাড়িতে কখনও আসেন না বা তাঁদের ছেলে মেয়েদেরও পাঠান না।

—বেগম সুরাইয়া কি উত্তর দিলেন?

—নবাবের যুক্তিপূর্ণ কথার কি উত্তর দেবেন বেগম? উনি কেবল নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন।

—উনি কি তনিমার বিয়েতে গিয়েছিলেন?

—না, ওঁনারা সেই উৎসবে যাননি বা কোন উপহারও পাঠাননি। যদিও তনিমার বিয়েতে দেবেন বলে বেগম সুরাইয়া তনিমার অজ্ঞাতে অনেক জড়োয়ার গয়না তৈরি করে রেখেছিলেন। এ ঘটনার পর বেশ কয়েক বছর সাজেহা বেগম বা তাঁর ছেলেমেয়েরা নবাব সুরাবর্দির বাড়িতে ঢুকতে সাহস করেন নি। তাঁরা স্পষ্টবাদী, সত্যবাদী, কর্তব্য-পরায়ণ নবাবকে ভয় করতেন।

—রবীন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, রাত ১১টা বাজে। আজ আমরা উঠি। আবার আসবো।

—রুদ্ধ কণ্ঠে মিঃ সোম রবীনের দু'হাত ধরে বললেন, আপনি আমাকে মাপ করবেন। আমার ওপরে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে।

তাই আমার না বলা কথার ঝাঁপি আপনাদের সামনে খুলে ধরতে চাই। আমার যদি শক্তি থাকতো—তবে মিঃ রায়ের মত ধনীকে আমার পর্ণ কুটীরে আসতে অনুরোধ করতাম না।

—রথীন বললো—না, আপনি এজন্য কিছু মনে করবেন না। একটা কথা শুধু আমি জানতে চাই।

—কি কথা বলুন?

—ইউনুস সাহেবের যে বাড়িটা আমি কিনতে এসেছি সেই বাড়িতে কোন অপমৃত্যু হয়নি তো?

—আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি—তা ছাড়া আপনিও অন্যান্য সোরস্ থেকে খবর নিয়ে জানাবেন। সে বাড়ি দূরে থাক কলকাতাতেই তাঁদের দুই ভাই-এর মৃত্যু হয়নি। উভয়ের মৃত্যুই তাঁদের পূর্ব বাংলার বাড়িতে ঘটেছে।

—বেশ, তবে আমি বাড়িটা কিনবো। আপনি আপনার সলিসিটার দিয়ে কাগজ পত্র রেডি করে রাখবেন। একটি শুভদিন দেখে তা রেজিস্টারী করা হবে।

উভয়ে নমস্কার করে কারে গিয়ে উঠলেন। আজ রমাকে কোথাও দেখা গেল না। কাহিনী শেষ না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না এই কাহিনী শোনাবার এত আগ্রহ মিঃ সোমের কেন? আর কেনই বা রমা এই কাহিনী শুনবার জন্য কাল তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল। আজ রমা নেই। কিন্তু যাবার পথে বাড়ির ছাদে বসে একটি রমনীর গিটার বাজার শব্দ শোনা গেল। গীটারে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজানো হচ্ছিল। এ রমা ছাড়া আর কেউ নয়—তা এঁরা বুঝলেন।

৫

পরের দিন রথীন রবীনকে তার বাসা হতে তুলে আনবার সময় পথের থেকে বেশ কয়েক বোতল দামী বিলাতি হুইস্কী ও কিছু ফল কিনে বাক্স ভর্ত্তি করে তাদের বসবার সিটের সামনে পা-দানিতে রেখেছিল।

রবীন কারে উঠেই বাক্সটি দেখে বললো- এ আবার কি ?

—ও কিছু না। আয় বোস্।

—কিছু না মানে ? দস্তুর মত দেখতে পাচ্ছি দুটো বাক্স। এ সব বাক্সে কি আছে ?

রথীন হেসে উত্তর দিলো—বুড়ো মনে করেছে বয়সের দোহাই দিয়ে আমাদের তাঁর কাছে ঋণী করে রাখবে। তা হবে না। আমি আজ মিঃ সোমের জন্য হুইস্কী এবং মিস্ সোমের জন্য কিছু ফল নিয়ে যাচ্ছি।

রবীন খুশী হয়ে রথীনের পিট চাপড়িয়ে বললো, দ্যাটজ দ্যা আইডিয়া। এই তো সুন্দর প্রতিদান। বৃদ্ধকে তাঁর গল্প শোনাবার জন্য না-ই বা টেনে নিলি তোর বাড়িতে। বৃদ্ধ জীবনে বোধ হয় অনেক ঘা খেয়েছেন। মনে পড়ে প্রথম দিন বলেছিলেন এই রমাই আমার একমাত্র বন্ধন। কাল বললেন, আমার নাতিরা বেঁচে থাকলে আপনাদের বয়সী হতো। অর্থাৎ পুত্র, নাতি কেউই তাঁর বেঁচে নেই।

—দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। তবে বাড়িটা আমি কিনেই ফেলবো ঠিক করেছি।

—তুই কি এই বাড়িতে থাকবি ?

—ক্ষেপেছিস তুই ! আমার বাপ পিতামহের বাড়ি ছেড়ে আমি যাবো ঐ বাড়িতে থাকতে।

—তবে এত টাকা খরচ করে ঐ বাড়ি কিনছিস কেন ?

—যা আমি ব্যয় করবো—তার কম পক্ষে ছয় গুণ বেশী আমি উঠাবো ঐ বাড়ি হতে। তা ছাড়া অমন সুন্দর লাইব্রেরীটা লোভনীয়। এত বড় লাইব্রেরী কি কেবল পোকায় নষ্ট করবে ?

গল্প করতে করতে কার এসে থামলো মিঃ সোমের বাড়ির সামনে। প্রতিদিনের মত দারোয়ান এসে কারের দরজা খুলে সেলাম ঠুকে দাঁড়াতে রবীন বাক্স দুটো নিয়ে যেতে বললো। দাড়োয়ান বাক্স দুটো নিয়ে ভেতরে একটি বেয়ারাকে ডেকে তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলো ভেতরে।

প্রতিদিনের মত মিঃ সোম ড্রইং রুমে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বাক্স দুটো দেখে মিঃ সোম প্রশ্ন করলেন—এ দুটো কিসের বাক্স ?

রথীন বললো, ও কিছু নয়। আপনার জন্য সামান্য কয়েক বোতল হুইস্কী ও মিস্ সোমের জন্য কিছু ফল।

—মিঃ সোম বললেন, গ্ল্যাড্ টু রিসিভ দিজ্ প্রেজেন্টস্। আপনি আমার সামান্য এক কাপ চায়ের মূল্য কিন্তু অনেক বেশী দিলেন। অবশ্য আপনাদের মত ধনীর কাছে এটা কিছুই নয়। বাই দ্যা বাই আপনার ডিড্ রেডি হয়ে গেছে। আপনি যে কোন দিন আমার সলিসিটার মিঃ বাসুর কাছে চলে যাবেন।

—পেমেণ্ট কার কাছে কার নামে করবো ?

—তাও উনিই বলে দেবেন। ''বেগম সুরাইয়া এণ্ড নবাব সুবাবর্দি ট্রাস্টি' এই নামে চেক দেবেন। এই ট্রাস্টি বডিই বেগম সুরা-ইয়াব নামে একটি মেয়েদের কলেজ পরিচালনার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন ও নবাবের নামে একটি 'ওল্ড এইজ হোম' শুরু করার ব্যবস্থা করা হবে।

—রথীন ও রবীন দুজনই উৎফুল্ল হয়ে বললো, চমৎকার প্রস্তাব। খুব ভাল কাজ করছেন।

বয় এসে নৈমিত্তিক ব্যবস্থা মিঃ সোমের জন্য হুইস্কী ও অতিথিদের জন্য চা ও জলখাবার সাজিয়ে রেখে গেল।

—মিঃ সোম বললেন, আজকের খাবার কিন্তু আপনাদের টেস্ট

করতে হবে। কারণ এ আমার রমাদির তৈরী খাবার। দিদি আমার সর্বগুণান্বিতা। যেমনি পড়াশুনা, গান বাজনা, সেলাই, রান্না—তেমনি কোমল মন তার। আজকালকার দিনে এমন পরোপকারী মেয়ে হয় না। জীবনে সব কিছু হারিয়েছে বলে এমন করে বিলিয়ে দিতে পারছে বোধ হয়।

কোন কুমারী মেয়ে সম্বন্ধে কোন যুবকের ঔৎসুক্য দেখানো শোভনীয় নয়। এ শিষ্টাচারের কথা মনে পড়ায় তাঁরা উভয়ে শিষ্ট বালকের মত নীরবে চায়ের কাপে মুখ দিলেন। মিঃ সোমও হুইস্কীতে মুখ লাগিয়ে শুরু করলেন তাঁর অসমাপ্ত কাহিনী।

ইতিমধ্যে ভারত পেয়েছে স্বাধীনতা। বাংলা, পাঞ্জার যে দুটি দেশের যুবকদের রক্তে এসেছে স্বাধীনতা—চতুর বৃটিশ সরকার যাবার সময় কৌশলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে এই দেশপ্রেমিক দেশ দুটোকে দ্বিখণ্ডিত করলো। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তানের নাম দেওয়া হলো পাকিস্তান। পরে অবশ্য জানেন আপনারা, কাশ্মীররের খণ্ডাংশও এরা দখল করেছিল। হুমায়ুন সাহেব তখনও কলকাতাতেই থাকতেন। তনিমা ও ফারুক হুমায়ুনের পরিবারেই থাকতো।

—কেন ফারুক তনিমাকে তার পৈত্রিক ভিটেতে নিয়ে যায়নি?

—ফারুকের দৌলতে পূর্বেই সালেহা বেগমের পৈত্রিক বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। কারণ ফারুকের গুণের তো অভাব ছিল না। একদিন কলকাতার নিউ মার্কেট বা প্রাক্তন হক মার্কেটের এক জুয়েলার এসে নবাব সুরাবর্দিকে বললেন, আপনি যে সেদিন দুটো হীরের আংটি এনেছিলেন—তার দামটা।

শুনে তো নবাব সাহেব আকাশ থেকে পড়লেন। জীবনে ধার করে কোন কিছু, তিনি কখনও কিনতেন না। তিনি কিনা একটি নয়, দুটি হীরার আংটি কিনেছেন বাকীতে?

নবাব সাহেব ধীর স্থির ভাবে প্রশ্ন করলেন, কত দামের কি রকম হীরা? কি রকম চেহারার লোক তা নিয়েছে? কবে নিয়েছে?

সব জেনে নিয়ে তিনি বুঝলেন—এটা ফারুকেরই কাণ্ড। সে জানে বেগক সুরাইয়া তনিমাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। তাই ফারুকের এই অপরাধের মাশুল তিনি দেবেন।

—নবাব সাহেব কি এই টাকা গচ্চা দিয়েছিল?

—মোটেই না। তিনি জুয়েলারদের খুব ধমক দিয়ে বললেন, আপনারা মশাই কেমন ব্যবসায়ী? রাম, শ্যাম, যদু, মধু—যে কোন লোক যার তার নাম করলেই আপনি তাকে না চিনে তাকে গয়না দেবেন। আমার সই আপানাদের জানা আছে। আমি কি কোন চিঠি দিয়েছি—সেই লোক মারফৎ?

লোক দুজন ধমক খেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে বললো, না, আপনার লেখা কোন চিঠি দেখায়নি। তবে আপনি তো হামেশা আমাদের দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে থাকেন—তাই আপনার নাম করায় অবিশ্বাস করিনি। কারণ তার হাতে একটা আংটি দেখলাম -যেটা আপনি আমাদের দোকান থেকে কিছুকাল আগে কিনেছিলেন। সেই হীরার আংটিটা দেখেই আমরা আর সন্দেহ করিনি।

—একই ডিজাইনের দুটো আংটি কি হতে পারে না? হয়ত আপনাদের আংটিটা দেখেই অন্য কেউ ঐ রকম আংটি তৈরি করেছে। তা ছাড়া আমি কি জীবনে কখনও ধারে আপনাদের থেকে কোন জিনিষ কিনেছি?

ভদ্রলোক দুজন আমতা আমতা করে বলে—না তা কখনও করেননি বলেই আমাদের সন্দেহ হওয়ায় আপনার কাছে খোঁজ করতে এসেছি।

—আমি দুঃখিত, এ বিষয়ে আমি কোন সাহায্য করতে পারলাম না। তবে আপনাদের মত নামী বিচক্ষণ ব্যবসায়ী কেন এমন কাঁচা কাজ করলেন জানি না। যে ৪২০ ঐ হীরার আংটি অন্যের নাম ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে সে কখনই টাকা দেবে বলে মনে হয় না। ভবিষ্যতে কোন কারণে কেউ যদি আমার লেখা চিঠি নিয়েও আপনাদের কাছে যায়—কখনো তাকে কোন কিছু দেবেন না। আমি নিজে গিয়ে যা হয় কিনে নেবো আমার প্রয়োজন মত।

—নবাব সাহেব প্রকৃত দোষীকে ধরিয়ে দিলেন না কেন ?

—পারিবারিক একটা কেচ্ছা ছড়িয়ে পড়বে। তাই তিনি স্ত্রীকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন সেই হীরার আংটি কোথায় ?

বেগম সুরাইয়া বললেন, ঐ আংটি তনিমার খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই তিনি ঐ আংটি তনিমাকে দিয়েছিলেন। নবাব সাহেব তখন ফারুকের কীর্তি সব বেগমকে জানিয়ে বলেন, দোকানীর বিশ্বাস জন্মাবার জন্য ফারুক ঐ আংটি পরে গিয়েছিল। তিনি বেগমকে খুবই তিরস্কার করলেন এই ভাবে একটি দুর্জন চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নবাবের মান সম্ভ্রম নস্যাৎ করার জন্য।

—কিন্তু বেগম সুরাইয়ার তো কোন দোষ ছিল না। দোষীকে কেন তিনি তিরস্কার করলেন না ?

—তিনি তখনই ফোন করে হুমায়ুনকে সব ব্যাপার জানালেন। নবাবের রক্ত তাঁর শরীরেও ছিল। সুতরাং এতে তিনি নিজেও খুব অপমানিত বোধ করলেন। নবাব সুরাবর্দি কেবল হুমায়ুনকে ফোন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তনিমাকে ফোন করে ভৎর্সনা করে জানালেন—এভাবে তার স্বামী বঞ্চনা করে ইণ্ডিয়াতে নিস্তার পাবে না। কারণ সেই নামী দোকানী পুলিসে খবর দিয়েছে। তনিমা কেঁদে বলে, সে এ সব বিষয় কিছুই জানে না। তার থেকে একদিন আংটিটা নিয়ে সে এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি বলে বের হলো। কথায় কথায় ফারুক তার থেকে জেনে নিয়েছিল কোন্ দোকান হতে আংটিটা কেনা হয়েছিল।

—পুলিস কি ফারুককে ধরতে পেরেছিল ?

—মোটেই নয়। শ্বশুর ও স্ত্রীর থেকে নবাব সুরাবর্দির সন্দেহ ও পুলিসের খবর শুনে সেই রাত্রেই সে পূর্ব পাকিস্তানে হুমায়ুন সাহেবদের দেশের বাড়িতে পালিয়ে গেল। অমন দুর্জন ধূর্ত আমি জীবনে দু' দেখিনি।

—এরপর ফারুক আর কলকাতায় এসেছিল কি ?

—নবাব সুরাবর্দিকে সে ভয় করতো। তাই আসবার সুযোগ ে

পায়নি। যদিও নবাব সুরাবর্দির সম্পত্তি গ্রাস করবার প্রবল ইচ্ছে তার মনে মনে ছিল এবং সে কথা সে প্রকাশও করেছিল। কিন্তু ভগবান সেদিক দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে ইউনুস প্রচুর টাকা উপায় করেছেন—কিন্তু ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি বা না দেওয়া যেন তাঁর অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিল। ফলে ইনকাম-ট্যাক্স হতে তার নামে মোটা অঙ্কে ইনকাম-ট্যাক্সের নোটিশ আসে। তিনি তখন তাঁর এই বাড়িটা ছোট বোন ও ভগ্নিপতিকে ট্রাস্ট করে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান।

ফারুক দখল করে বসেছিল নবাব ফের্দৌসীর চট্টগ্রামের শহরের বাড়িটা। ইউনুস গিয়ে উঠলেন পাহাড়তলীতে পর্বত শিখরে নবাব ফের্দৌসীর রম্য নিকেতন "স্নিগ্ধচ্ছায়ায়।" নামের সঙ্গে বাড়িটির যেন একটা অদ্ভুত মিল ছিল। চারদিকে নানা ফুলের বাগিচার মধ্যে একটা স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে এই প্রাসাদ যেন সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

ধূর্ত ফারুক প্রথমেই এসে তার ছদ্ম অমায়িক ব্যবহারে বৃদ্ধ ইউনুস সাহেবের মন ও বিশ্বাস জয় করে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে কদম বাড়িয়ে সে ইউনুস সাহেবের কমফরটের ব্যবস্থা করার নামে ইউনুস সাহেবকে সম্পূর্ণ রূপে তার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসে।

—তনিমা তার কাকার কাছে যেতো না? বা তার স্বামীর কোন দূরভিসন্ধির খবরও রাখতো নাকি?

—তনিমাকে ফারুক জানতেই দেয়নি যে তার আঙ্কেল স্নিগ্ধ-চ্ছায়ায় আছেন। বরং তনিমা বার কয়েক স্নিগ্ধছায়ায় গিয়ে থাকতে চেয়েছে। উত্তরে ফারুক তাকে জানিয়েছে স্নিগ্ধচ্ছায়া ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

—বেগম সুরাইয়ার থেকেও তনিমা কি এ খবর পাননি?

—ফারুককে বিয়ে করার পর হতে তনিমার সঙ্গে বেগম সুরাইয়ার আর কোন সম্পর্ক ছিল না। তা ছাড়া ইউনুস তাঁর ভাবি ও দাদাকে নানা কারণেই পছন্দ করতেন না—বিশেষ করে সাজাহান সাহেবের

মত এমন আপন ভোলা লোকের বিদেশ বিভূঁয়ে খোরপোষ বন্ধ করে দেওয়ার হৃদয়হীনতার কথা জেনে। সেজন্য ইউনুস সাহেবের চট্টগ্রামে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের খবর তাঁদের কাছেও অজ্ঞাত ছিল।

—তারপর কি হলো? জামাই তো শ্বশুরের পরিচর্যা ভাল ভাবে করছিলেন।

—তা একরকম ভালই বলতে পারেন। তবে ভাল ফারুকের জন্য। ইউনুস সাহেবের জন্য নয়।

—আপনার কথাটা যেন কেমন হেঁয়ালি শোনাচ্ছে।

—মিঃ সোম এক পেগ হুইস্কী ঢেলে বললেন—ধীরে বন্ধু ধীরে। এত শীগ্‌গির কি কাহিনীর গতি রোধ করতে হয়। শিল্পীর তুলির মত অতি ধীরে ধীরে তার গতিকে চালিত করতে হয়।

ফারুক আস্তে আস্তে ইউনুস সাহেবের সব স্বাধীনতা কেড়ে নিলো। বহুকালের নবাব ফের্দৌসীর পুরান আমলের যে সব কর্মচারী বা তাদের বংশধররা বংশানুক্রমিক ভাবে আনুগত্য স্বীকার করে প্রভুদের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতো—একে একে তাদের সবাইকে নানা অছিলায় ছাড়িয়ে দিল। সেই সব স্থলে বহাল করলো তার নিজের দুর্ধর্ষ সব লোককে—যারা তারই মত, যে কোন ক্রিমিন্যাল কাজ করতে ইতস্ততঃ করতো না। বেচারি ইউনুস সাহেবের স্নিগ্ধছায়ার বাইরে গতিবিধি বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তাঁর পরিচিত মণ্ডলী বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেল। এক কথায় তিনি সম্পূর্ণ বন্দী।

—ফারুকের এই বৃদ্ধের সঙ্গে এ ধরনের আচরণের কারণ কি?

—ফারুক তনিমাকে বিয়ে করে বলেছিল গর্ব ভরে—আমি নবাব ফের্দৌসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন সাহেব, তস্য ভ্রাতা ইউনুস সাহেব ও জামাতা নবাব সুরাবর্দির সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবো।

—একথা তার পিসি সালেহা বেগম শুনেছিলেন কি?

—নিশ্চয়ই শুনেছেন। কারণ কলকাতায় বসে যখন আমরা তার এই স্পর্ধার কথা শুনলাম, তখন একই ছাদের নীচে বাস করে তিনিও

নিশ্চয় শুনেছেন। কিন্তু শুনলেও করবার তখন তাঁর কোন এক্তিয়ার নেই। ফারুক তখন আউট অব্ কন্‌ট্রোল। সরলা শান্ত প্রকৃতির তনিমা স্বামীর অন্যায় সমর্থন তো করতোই না বরং মনে মনে ঘৃণা করতো। তবু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না। তবে হয়ত তাকেই মেরে ফেলতো। শুধু তাই নয় শিক্ষিতা এই স্বল্পবয়সী মেয়েটির উপর সে জুলুম কম করেনি। বিয়ের পর হতে প্রতি বছরই তনিমার একটি করে সন্তান জন্মাতে লাগলো। এতে তনিমার শরীরও ভেঙ্গে গেল। মনের জোরও গেল কমে। এ সবই ঐ দানব করেছিল সুপরিকল্পিত ভাবে—যাতে তনিমার তরফ হতে বাধা আসলে সে রুখতে পারে। এমন ভাবে সে প্রতি বছর তাকে সন্তান উপহার দিয়েছে যাতে কোন প্রকারে সে তাকে ডিভোর্স করতে না পারে। অর্থাৎ এতগুলি সন্তান নিয়ে অন্য কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। তা ছাড়া জননী তনিমাও সন্তান-দের ছেড়ে যেতে পারবে না। সন্তান প্রসবের পর নারীর সৌন্দর্য বহুলাংশে নষ্ট হয়। এই কারণেই সে এই ধরনের কাজ করে স্ত্রী তনিমার সঙ্গে তার বৈবাহিক সূত্র সুদৃঢ় করে রেখেছিল।

—ওঃ, এ যে দেখছি একটা মস্ত ভিলেন।

—কথাটা ঠিকই বলেছেন। সত্যি সে ভিলেন। জানি না এই পরিবারের সঙ্গে নবাব ফের্দৌসী কি করে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। এবার আসা যাক ইউনুস সাহেবের প্রসঙ্গে। তিনি কেবল জাঁদরেল পলিটিসিয়ান ও স্কলারই ছিলেন না, তাঁর স্বাস্থ্যও ছিল বোবাস্ট। কিন্তু ফারুকের বাবুর্চি কি যে রান্না করে খাওয়াতো তা ভগবানই জানেন। তবে তাঁকে যে স্লো পয়জনিং করা হচ্ছে, সেটা বোঝা যেতো। কারণ তিনি সব সময়ই ঝিমিয়ে থাকতেন। অতি দ্রুত জরা বার্ধক্য তাঁকে গ্রাস করলো।

—নবাব সুরাবর্দি ও বেগম সুরাইয়া এ সব খবর কি জানতেন?

—তাঁদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ রাখতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের চিঠিপত্র খুলে ফারুক সব নষ্ট করে দিতো। আর ইউনুস সাহেবকে সে বলতো—দেখুন আঙ্কেল, আপনি সর্বস্ব দিয়ে এসেছেন

অন্টি ও নবাব সাহেবকে, অথচ তাঁরা এত মাসের মধ্যে একটা চিঠি দিয়ে আপনার খোঁজ খবর নিলেন না। অবশ্য প্রথম দিকে ইউনুস সাহেব তা বিশ্বাস করলেও—নিজের দুরবস্থা দেখে বুঝেছিলেন এর মধ্যেও ফারুকের কারসাজি আছে।

মিঃ সোম গ্লাসে এক পেগ হুইস্কী ঢেলে বললেন—হ্যাঁ, আপনি কি প্রশ্ন করছিলেন মিঃ সেন? বেগম সুরাইয়ার কানে গিয়েছিল কিনা এসব কাহিনী? হ্যাঁ, তিনিও লোক মারফৎ এসব খবর পেয়েছিলেন। চট্টগ্রাম হতে অনেক স্বদেশবাশী নবাব সুরাবর্দির বাড়ি ইউনুস সাহেবের হতভাগ্যের কথা জানিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে ইণ্ডিয়াতে থেকে পাকিস্তানের এই ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না।

—কেন, এ বিষয়ে তিনি তো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিতে পারতেন।

—ফারুক গুণের আঁধার, এ কথা আপনাদের পূর্বাহ্নেই বলেছি। ফারুক ওখানে গিয়ে নবাব ফেরদৌসীর প্রতিনিধি রূপে প্রজাদের থেকে কর ইত্যাদি আদায় করে বেশ সুখেই ছিল। শুধু তাই নয়, ঘন ঘন পার্টি এবং ডালি ইত্যাদি দিয়ে ওখানকার সরকারী আমলাদের হাত করেছিল। বিশেষ করে থানা পুলিসকে এমন ভাবে কব্জায় নিয়েছিল যে তার হাবভাব দেখে মনে হতো সে একজন কেষ্টবিষ্টু বা সেই-ই যেন একজন নবাব। তাই নবাব সুরাবর্দির তার বিরুদ্ধে যে নালিশ জানিয়েছিলেন হোম ডিপার্টমেণ্টে, তা বোধ হয় ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটেই গিয়েছিল কোন প্রতিকার হয়নি।

—আচ্ছা পাকিস্তান হবার পর নবাব সুরাবর্দি কেন তাঁর স্বদেশে ফিরে গেলেন না। ওখানেই তো তাঁর স্টেট ছিল।

—নবাব সাহেব বলতেন, কি হবে ওখানে গিয়ে? যারা এখন ওখানে মন্ত্রী হয়ে বসেছে বা বড় বড় পদে আসীন হয়েছে তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল আমার প্রজা—গোলাম। এরা আমার যোগ্য সম্মান দিতে পারবে না—বরং আমাকেই এখন সরকারী নানা কাজে এদের কুনিশ করতে হবে। এখন যত রিক্সাওয়ালা, চাষা-ভূষা-

এরাই তো ভাল পোষাক পরে ভদ্রলোক সেজে অ্যাসেম্বলী বা-পার্লামেণ্টের মেম্বার হয়েছে। শেষ জীবনটা কি নিজের মান ইজ্জত খুইয়ে ওদের কাছে হাত জোড় করে জো হুজুর বলবো! কখনও নয়। তার চেয়ে বরং এই ভাল। আমাদের বন্ধু-বান্ধব রাজনীতির সহকর্মীরা এ বাংলাতেই আছে। এখানে সবাই আমাকে ও আমার পিতৃপুরুষকে ভালভাবে চেনে। আমি এখানে চেনা বামুন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নও জোয়ানদের কাছে আমি অপরিচিত। তাই আমার মূল্য বুঝাবো কি করে? এই সব কারণেই তিনি স্বদেশে ফিরে যাননি। তাছাড়া ভারতের মত পাকিস্তান সরকারও তো সব স্টেট নিয়ে নিয়েছে। সুতরাং জমিদারির লোভে ওখানে গিয়ে কি লাভ? তার চেয়ে বরং এখানে নানা 'ফর ইন' কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটার হয়েছিলেন। তা ছাড়া বিদেশের সঙ্গে নানা ব্যবসা করে তিনি প্রচুর টাকা উপায় করছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে পলিটিক্সও চলছিল

—তারপর ইউনুস সাহেবের কি হলো?

—একদিন শোনা গেল তিনি হার্টফেল করে মারা গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁর ওখানকার ব্যাঙ্কের টাকা, শেয়ারের টাকা সবই ফারুক তাঁকে মারবার আগে তাঁকে দিয়ে এট্ দি পয়েণ্ট অব্ রিভলবার লিখিয়ে নিয়েছিল।

—হুমায়ুন সাহেব বা তাঁর পুত্র কি তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে ফারুকের বিরুদ্ধে কিছু করেছিলেন?

—স্বল্প দিনেই তাঁরা ফারুকের অতি দুর্ধর্ষ প্রকৃতি ধরে ফেলেছিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁদের করবার কোন ক্ষমতাই ছিল না। কারণ তার মত দুর্ধর্ষ দুর্জনের কোন কাজের প্রতিবাদ করতে যাওয়ার অর্থ প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। প্রাণের দায়ে নীরবে তাঁরা সব অন্যায় সয়ে গেলেন। সবার উপরে ছিল বহু কালের নামজাদা নবাব পরিবারের ইজ্জৎ সম্ভ্রম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিঃ সোম বললেন—রাত ১১-টা বাজলো।

আজ আর নয়। আপনাদের কয়দিন ধরে খুব কষ্ট দিচ্ছি। শেষের আর বেশী দেরি নেই। তবে মিঃ সেন, কাহিনীটা লিপিবদ্ধ করবে দয়া করে।

—নিশ্চয়ই, তা নয়ত এত সময় নষ্ট করে কেন এ্যাদ্দিন এখানে আসছি, আর আপনার মত বৃদ্ধকে এত উত্যক্ত করছি গল্প বলা জন্য ?

—না না, তা মোটেই নয়। এ সব পুরানো কাহিনী বলতে আমা ভালই লাগে।

—একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।

—বলুন, কি আপনার জিজ্ঞাসা ?

—নবাব সুরাবর্দিরও কি অপমৃত্যু হয়েছিল ?

—সে চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোকবে ঘায়েল করা এত সহজ ছিল না। পরে তা সবই জানাবো। তবে হুমায়ুন সাহেবের পরিবারে আরও অপমৃত্যু ঘটেছে, সবই আস্তে আ শুনবেন।

প্রতিদিনের মত নমস্কার করে আসর ভেঙে রথীন ও রবীন বেরিয়ে এলো।

শীতের হাওয়া বইছে। বাগানের গাছগুলি পত্রহীন। মৌসুমী নানা রঙের ফুলে মিঃ সোমের বাগান দেখতে অপূর্ব হয়েছে। এক পাশে গোলাপের বাগিচায় নানা রং-এর গোলাপ ফুটে রয়েছে। হাল্কা কুয়াশার জাল যেন বিছিয়ে আছে শহরের বুকে। লোকজ ট্রাম বাস ট্যাক্সির আনাগোনা অনেক কমে গেছে। একমাত্র পা বিড়ির দোকান ছাড়া প্রায় সব দোকান বন্ধ। রাস্তার নিয় লাইটগুলির স্নিগ্ধ আলো এই কুয়াশা ঘেরা রাতে দেখতে ভারী ভা লাগছে।

রথীন বললো—আমি ভাবছি কালই আমি ইউনুস সাহেবে বাড়িটার দলিল রেজিস্টারী করবো।

—কেন, আবার তুই উড়বি নাকি ?

—হ্যাঁরে, আমাকে আবার আমেরিকা যেতে হচ্ছে ব্যবসার খাতিরে।

—কবে ফিরবি ?

—ঠিক বলতে পারছি না। তবে এজন্য তোর কোন অসুবিধে হবে না। আমার ড্রাইভারকে ইন্‌স্ট্রাকশন্ দেওয়া থাকবে তোকে পাবিয়ে দিয়ে যাবে। আবার রাত ১১ টাতে এসে তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

—তার কি প্রয়োজন ? আমি নিজেই না হয় ট্রামে যাওয়া-আসা করবো।

—আসতে না হয় পারবি। কিন্তু রাত ১১টাতে বের হয়ে লাস্ট ট্রাম বা বাস ধরতে পারবি কিনা সন্দেহ। পারলেও ভীষণ ভিড় হবে। তা ছাড়া এ সময়ে নানা রকম খারাপ লোক উঠে—এই যেমন জুয়ারী, মাতাল, পকেটমার ইত্যাদি। তোকেও খুব বেশীদিন কষ্ট করে এ সব শুনতে হবে না বোধ হয়। দুটো খুন তো ঘটেই গেল, বাকী আছে একটি মাত্র।

—তুই কি কাল থেকেই আর যাচ্ছিস্ না ?

—নারে, আর বোধ হয় যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ পরশু আমি ফ্লাই করবো। কাল কিছু কাজ আছে। তা ছাড়া কয়েকজনের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত দেখা সাক্ষাৎও করতে হবে। তবে তাই বলে, তুই মাঝ পথে কেটে পড়িস না। প্লটটা গোটা পিক্-আপ করে নিস।

—না, আমি মাঝ পথে থেমে যাবো না। কারণ আমার একটা নতুন বই-এর উপাদান বোধ হয় পাচ্ছি এর মধ্যে।

৬

পরদিন রবীন একাই এলো। প্রতিদিনের মত তাকে স্বাগত জানালেন মিঃ সোম। বললেন—বন্ধুটির সঙ্গ এরই মধ্যে হারিয়েছেন বুঝি? উনি বোধ হয় বৃদ্ধের এই এক ঘেঁয়ে কাহিনী শুনতে শুনতে বিরক্তি বোধ করে কেটে পড়েছেন।

—তা নয়। রথীন কাল আমেরিকায় ফ্লাই করছে, ওদের ব্যবসার কাজে। তাই আজ সে খুব ব্যস্ত। তার এই অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির জন্য আপনার কাছে মাপ চেয়েছে।

—হ্যাঁ, আমি আমার সলিসিটারের কাছ থেকে খবর পেয়েছি উনি বাড়িটা কিনে নিয়েছেন এবং কাল ফর ইন-এ যাচ্ছেন। ওঁনার মত 'বিজি' লোক যে চারটা সিটিং দিয়ে আমার খাপছাড়া গল্প শুনেছেন সেটা আমার সৌভাগ্য। ওঁনাদের মত বিজনেস ম্যাগনেট কি এভাবে অলস গল্প-গুজবে মজে সময় নষ্ট করতে পারেন?

—সত্যি সে খুব বিজি ম্যান। আমিই ওকে এ ক'টা দিন এক রকম টেনে এনেছি।

—দেখুন তো দু'দিন দু'কাপ চা খেয়েছেন, তার প্রতিদানে কত খরচ করে এত দামী এত বোতল মদ ও এত ফল দিয়ে গেলেন।

—না না, ও কিছু না। আপনি কিছু মনে করবেন না। এইটে ওদের বাড়ির রেওয়াজ। কোথায় কিছু খেলে তার চারগুণ করে তা ফিরিয়ে দেয়।

—জানি ওঁনারা কোটিপতি। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে, এভাবে অ্যাক্‌সেপ্ট করতে। আমার দিদিটিও এ নিয়ে অনুযোগ করছিল। কিন্তু আমি বললাম—এঁদের মত কোটিপতির কাছে এসব কিছুই না। তবে উনি যখন নিজে বয়ে আনলেন—নেবো না বলা মানে তাঁকে অপমান করা। তাই আমাকে নিতেই হলো।

আজ প্রতিদিনের মত চায়ের সঙ্গে রমা দেবীও এলেন। উনি দু'হাত তুলে নমস্কার করে চা ও খাবার রবীনের সামনে সাজিয়ে দিয়ে বললেন, আজ একা! বন্ধুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে বুঝি!

মিঃ সোম উত্তর দিলেন—নারে, মিঃ রায় কাল স্টেটে ফ্লাই করছেন। তাই একটু ব্যস্ত।

রমা মৃদু হেসে বললো—সত্যি দাদু এমন সব কাজের লোককে তোমার সেই আদ্যি কালের গল্প শোনাতে কেন যে ডাকতেন?

—এ আপনার রাগের কথা। গল্প তো গল্পই, তার রস আদি অনন্ত কাল হতেই একই রকম। আদ্যি কালের গল্পের রস তো কখনও নীরস হয় না। বরং আমরা সে যুগ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি না, যা শুনতে পেলে আনন্দ পাই। তাই তো অতীতের কাহিনীর ধারক ইতিহাস মানুষকে এত আকৃষ্ট করে। অতীতকে নিয়েই তো ইতিহাস।

রমা হেসে বললো—যাক, আপনার ভাল লাগলেই আমার দাদুর আনন্দ। আপনাদের ডিসটার্ব করা আমার উচিত নয়। আমি এখন উঠি তবে—বলে সে কক্ষ হতে বের হয়ে গেল।

মিঃ সোম বললেন—পাগলি দিদি আমার। বাইরের সব আঘাত হতে সে তার এই দুঃখী দাদুকে আগলে রাখতে চায়। কিন্তু সে বোঝে না 'নো আরমার এগেইন্স্ট ফেইট্' (No armour against fate)। থাক আমার প্রসঙ্গ। আসুন, আমরা নবাব পরিবারে ফিরে যাই।

যদিও তনিমার বিয়ের পর বেগম সুরাইয়ার সঙ্গে ভাই ভ্রাতৃবধূ ও তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সন্তানহীনা মাতৃ-হৃদয় বেশী দিন চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। নবাব সুরাবর্দির অনুমতি না নিয়েই নিজের হাতে নানা রকম খাবার করে ও মূল্যবান বস্ত্রাদি কিনে ড্রাইভার ও ঝি'র মাধ্যমে ভাইয়ের বাড়িতে পাঠাতেন।

—নবাব সাহেব কি তা জানতেন না?

—বিলক্ষণ জানতেন। বেগম ইচ্ছে করেই ড্রাইভারের মাধ্যমে

পাঠাতেন, যাতে খবরটা নবাবের কানে যায়। নতুবা প্রতিদিনই তো তিনি কত বাড়িতে কত খাবার পাঠাতেন তাঁর অন্যান্য ছোকরা ভৃত্যদের হাতে। এ সব নবাব জানতেন না। তাদের দিয়েই ইচ্ছে করলে বেগম তাঁর ভাবির বাড়ির খাবার ইত্যাদি পাঠাতে পারতেন। কিন্তু স্বামীর অগোচরে তিনি বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাননি। এই ভাবে আবার সম্পর্ক গড়ে উঠলো। তা ছাড়া সালেহা বেগম ভীষণ ধূর্ত মহিলা। যেমন ভাইপো, তেমনি তার পিসি। বেগম সুরাইয়ার স্নেহ প্রবণ হৃদয়ের সুযোগ নিয়ে তিনি আবার আর একদিন ছেলে ইউসুফ ও মেজ মেয়ে জারিনাকে নিয়ে এসে বললেন— তুমি এদের দুজনকে তোমার কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাও। আমি পাকিস্তান থেকে এদের খরচ পাঠাবো।

বেগম সুরাইয়া জিজ্ঞেস করলেন -তোমরা কি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছ ?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সালেহা বেগম বললেন—না গিয়ে কি আর উপায় আছে ? শুনছি ফারুক তোমার ভাই-এর নাম জাল করে এক এক করে সব তালুক তার নামে দানপত্র করে নিচ্ছে। যেমন সে তোমার ছোট ভাইজানের সম্পত্তি হাত করেছে। কপাল আমার মন্দ ! নয়ত নিজের ভাইপো জামাই হয়ে এমন শত্রুতা করছে।

—তোমার ভাইপোকে এত কাছে থেকেও তুমি চেনোনি ভাবি। কিন্তু আমি তাকে ভালভাবেই চিনেছিলাম বলেই তনিমার সঙ্গে তাকে মিশতে দিইনি। তুমি মা হয়ে মেয়ের মুখে বিষের পাত্র তুলে ধরলে। সারা জীবন তনিমা জ্বলে পুড়ে খাক হবে ঐ পাষণ্ডটার কাছে। এই বয়সেই এতগুলি সন্তান ঘাড়ে চাপিয়ে তার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য সব নষ্ট করে—তার মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ ঢেলে দিয়েছে।

—তখন কি জানতাম ছেলেটার পেটে পেটে এমন সব জট ছিল। তবে কি এমন ভুল করি ? তুমি তো ওকে নিজের মেয়ের মত কত রকম শিক্ষাই দিচ্ছিলে।

—তা কেন ? আমি তো তনিমার জন্য হায়দ্রাবাদের নবাব বংশের

ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও করেছিলাম। তারা রাজিও হয়েছিল। ছেলেটি কেবল নবাব বংশের নয়—উচ্চ শিক্ষিত, ইঞ্জিনিয়ার। তা ছাড়া নিজের একটা বড় ফ্যাক্টরী আছে। প্রচুর টাকা রোজগার করছে। তার পাশে তুলনা কর তোমার গণ্ডমূর্খ ঐ দুর্জন বেকার ভাইপোকে। কেন যে তোমার এমন দুর্মতি হলো জানি না।

—যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। ওখানে ভাল স্কুল নেই, তুমি ইউসুফ ও জারিনাকে তোমার কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাও। ইউসুফ সিনিয়ার কেমব্রিজ পরীক্ষাটা দিয়েই আমার কাছে চলে যাবে। চাটগাঁর গভর্ণমেণ্ট কলেজেই ওকে ভর্তি করিয়ে দেব।

—তুমি গতবার যা কাণ্ড করেছ—তাতে উনি রাজী হবেন কিনা জানি না।

—তোমার কথার ওপর নবাব সাহেব তো কথা বলেন না। তুমি তাঁর অনুমতি নিতে চাও—নিতে পার। তবে আমার তো মনে হয় না, তিনি তোমার কোন ইচ্ছার বিরোধিতা করবেন। তোমার স্বামী-ভাগ্য অতি বিরল।

—সে আমি জানি। উনি কখনই আমাকে দুঃখ দেবেন না। তুমি সত্যি বলেছ—স্বামী ভাগ্যে আমি গর্বিতা। যদিও আমার হতভাগ্য একটি সন্তানও আমাদের বাঁচলো না। এজন্য আমি আক্ষেপ করি, দুঃখ করি। কিন্তু উনি কখনও আমার সামনে এ নিয়ে আক্ষেপ করেন না। বরং বলেন, নাই বা রইলো আমাদের নিজেদের কোন সন্তান, এতিম ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করতে পারলে তবে তোমার সেই খেদ থাকবে না। তোমার ভাইপো-ভাইঝিরা রয়েছে। রয়েছে আমার ভাগ্নে-ভাগ্নীরা—তুমি তাদের মানুষ করো। এদের মধ্যে তুমি তোমার হারানো সন্তানদের খুঁজে পাবে। সত্যি ভাবি, এত বড় মন দুর্লভ। তবুও তাঁর অনুমতি আমার চাইতেই হবে। তুমি ওদের আজ রেখে যাও।

—নবাব সাহেব রাগ করবেন না তো ওদের দেখে?

--মোটেই নয়। বরং উনি খুশীই হবেন। উনিও বাচ্চাদের বড় ভালবাসেন।

—সালেহা বেগমের আর্জি মঞ্জুর হয়েছিল তো?

—নিশ্চয়ই। নবাব সুরাবর্দি ও বেগম সুরাইয়ার প্রেম যেন নবাব সাজাহান-মমতাজের প্রেম। উভয়ের মধ্যে কখনও কোন ব্যাপারে কোন মতানৈক্য হতে কোনদিন দেখিনি। একজন যেন অন্যের পরিপূরক। যে দেশেই নবাব সুরাবর্দি যান—যত দূর দেশই হোক—প্রতিদিন তিনি ফোনে বেগমের সঙ্গে একবার কথা বলবেন। নবাবের ফোনের প্রতিক্ষায় বেগম রাত ১২-১টা পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন। বেগমের সেবাযত্ন দেখে আমাদের আদর্শ হিন্দু নারীর কথা মনে পড়ে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি তাঁর খাওয়া দিতেন। হয়ত তাঁর কোন সন্তান ছিল না বলেই তাঁর সমস্ত মনোযোগ স্বামীর উপর দিতে পেরেছিলেন। শুধু জীবিত অবস্থায় নয়, মরণের পরও তিনি যেন অলক্ষ্যে তাঁর উপর চোখ রাখতেন।

—কিন্তু মুসলিমরা তো জন্মান্তর বিশ্বাস করে না।

--হয়ত করে না। কিন্তু নবাব সুরাবর্দি ও বেগম সুরাইয়া ঐসব এত বেশী বিশ্বাস করতেন, যে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। বাড়ির থেকে বের হবার পূর্বে পঞ্জিকাতে যাত্রা শুভ কিনা দেখে নিতেন। কোন শুভ কাজ করবার পূর্বে পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করে বাড়ির বাইরে পা বাড়াতেন। ওঁনারা জন্মান্তরবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন। শুধু তাই নয়। বেগম সুরাইয়া তো এক সময় প্ল্যানচেটেও বসতেন। এ সম্বন্ধে তবে আর একটা গল্প বলছি শুনুন।

বেগম সুরাইয়া আগে মারা যান। বিরাট প্রাসাদে পরিচারক পরিবেষ্টিত হয়ে বৃদ্ধ নবাব একা থাকতেন। রাত ৯টা বেজে গেছে তখনও উনি বসে বসে কোন বই পড়ছেন বা নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত বা সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজ-পত্রাদি দেখছেন। এমন সময় তাঁর সিলিং ফ্যান যেটা বন্ধ ছিল—তাতে হঠাৎ খট্ খট্ আওয়াজ হতো। প্রথম প্রথম নবাব সাহেব কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর ইলেকট্রিশিয়ানকে

ডেকে এনে দেখালেন। সে এসে টেস্ট করে বললো, ফ্যান ঠিকই আছে। পরের দিনও দেখলেন। বন্ধ পাখা নির্দিষ্ট সময়ে আওয়াজ করছে। তখন উনি ঐ ফ্যানটি অন্য ঘরে রিপ্লেস করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দেখলেন, সেই একই সময়ে ঐ ফ্যানে আওয়াজ হচ্ছে।

—ওটা কি সারাক্ষণ ঐ রকম শব্দ করতো?

—না, মিনিট দশ এ রকম আওয়াজ হতো। তাঁর কাছে যে বেয়ারারা থাকতো, তারা বলতো—সাহেব, এ ঘরে ভূত আছে। তারা চাকরি ছেড়েই পালাতে লাগলো। ব্যাপারটা নবাব সাহেবকে ভাবিয়ে তুললো। কিন্তু একদিন তিনি রাত ৯টার পূর্বেই তাঁর ডিনার সেরে নিলেন। সেদিন আর সেই আওয়াজ হলো না। তখন নবাব সাহেব বুঝলেন, বেগম সুরাইয়ার আশরীরী আত্মা তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার জন্য ঐ ভাবে তাগিদ দিচ্ছে, যেমন তিনি জীবিতাবস্থায় সচরাচর দিয়ে থাকতেন। তবেই বুঝুন—এই দুনিয়া ছাড়লেও স্বামী সোহাগিনী প্রেমিকা বেগম সুরাইয়া তাঁকে ভোলেননি।

—সালেহা বেগম তবে নবাব সুরাবর্দির অর্থে নিজের সন্তানদের মানুষ করেছিলেন বুঝি?

—এক্জাটলি সো। নবাবের গৃহে নবাবী চালেই তাঁর ছেলে-মেয়েরা মানুষ হচ্ছিলো বেগম সুরাইয়ার মাতৃস্নেহে সিঞ্চিত হয়ে।

যাবার আগে দাদা হুমায়ুন ও ভাবী সালেহা যখন নবাব সুরাবর্দি ও বেগম সুরাইয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসলেন, তখন বেগম তাঁদের বললেন—তোমরা পাকিস্তানে যাচ্ছ বটে, কিন্তু এতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। ছোট ভাইজানের মত এমন অজাতশত্রু লোককে ফারুক যে-ভাবে খুন করেছে, তাতে তোমার জন্য আমার বড় ভয় করছে মিয়া ভাই।

হুমায়ুন সাহেব উত্তর দিয়েছিলেন—আমার কিন্তু কলকাতা ছেড়ে, বন্ধু-বান্ধব ও তোদের ছেড়ে চাটগাঁয় যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কি করবো বল? তোর ভাবিকে কোন রকমেই বোঝাতে পারছি না।

নবাব সুরাবর্দি বললেন, আমার অবশ্য এ ব্যাপারে কোন কিছু বলা উচিত না—তবু বলতে হচ্ছে, আপনি ওখানে না গেলে বোধ হয় ভাল

হতো। ফারুক যদিও আপনার জামাতা, তবু বলবো—আপনার পক্ষেও তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলাই বাঞ্ছনীয়। এতে বিপদের সম্ভাবনা কম হতো।

সালেহা বেগম ঝাঁজিয়ে উত্তর দিলেন—তোমাদের সব কিছুতে বড় বাড়াবাড়ি। ছোট বেলা হতে ফারুককে আমি চিনি—সে করবে আমাদের ক্ষতি! তোমাদের সবার মাথা খারাপ হয়েছে।

নবাব সাহেব ও সুরাইয়া বেগম জানতেন সালেহা বেগমের সঙ্কল্প হতে কেউ তাঁকে টলাতে পারবে না। তবু বেগম সুরাইয়া বললেন—যা যা ঘটেছে শুনছি তাতে তো ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। দাদার নাম জাল করে সে যদি তোমাদের তালুকগুলি আত্মসাৎ করতে পারে, ভাইজানকে খুন করতে পারে—তবে দাদার পক্ষে অন্তত: আমি মনে করি জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়। যাক, তুমি তো তোমার ভাইপোর কোন দোষ দেখেও দেখবে না, তবে দেখো যেন আমার দাদার অপঘাতে মৃত্যু না ঘটে।

সালেহা বেগম তাঁর তিনটি সন্তানকেই ননদের কাছে রেখে বলে গেলেন, ইউসুফের পরীক্ষা হয়ে গেলেই ওকে পাঠিয়ে দিও। জারিনা তো লরেটো স্কুলে পড়ছে, সেতারাকেও কিণ্ডারগার্ডেনে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। পাকিস্তানে এখনও তো ভাল স্কুল হয়নি—তাই ওদের তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। নতুন রাষ্ট্র, সবই বিশৃঙ্খল—তাই তোমাকে বিরক্ত করছি। নতুবা আমারই কি ইচ্ছে করে ছেলেমেয়েকে ছেড়ে খালি ঝাড়া হাত-পা নিয়ে একা একা পাকিস্তানে যেতে।

—ভদ্রমহিলা খুব চালাক—নয় কি? সব ছেলেমেয়েকে বেগম সুরাইয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে উনি বেশ চলে গেলেন। শিশু সেতারাকে তিনি কি ভাবে ছেড়ে গেলেন? চট্টগ্রামে তো মিশনারী স্কুল আছে সেই বৃটিশ আমল থেকে। সুতরাং ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই সেখানে সেতারাকে পড়াতে পারতেন!

—বুঝতেই তো পারছেন মিঃ সেন, মহিলার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

—রবীন বললো, আজ অনেক রাত হলো, এবার আমি উঠি। মিঃ

সোম ব্যস্ত হয়ে বললেন—তাই তো আজ আপনি একা। আপনাকে পৌঁছে দেবে আমার ড্রাইভার।

—না, তার প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেই যেতে পারবো, এখনও সব যানবাহন চলছে। রাত বেশী হয়নি।

৭

—মিঃ সোম পরদিন শুরু করলেন তাঁর কাহিনী। বছর ৪-৫ পর জারিনা বেগম সুরাইয়ার আদর-যত্নে প্রতিপালিত হয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর মার কাছে পাকিস্তানে বেড়াতে গেল। তিন বোনের মধ্যে জারিনাই সর্বাপেক্ষা বেশী সুন্দরী, সরলা, স্নেহপ্রবণ। সে স্বল্প দিনের মধ্যে পিসির অনেক গুণ পেয়েছিল। পিসিকেও সে সত্যি ভালবাসতো। জারিনাকে দেখে বেগম সুরাইয়ার কাছে অনেকেই তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। তিনিও মনে মনে এদেরই কারো একজনের উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে জারিনার বিয়ে দেবেন স্থির করেছিলেন। এরা প্রায় সকলেই কোন না কোন দেশের নবাব পরিবারেব সঙ্গে যুক্ত শিক্ষিত উপার্জনক্ষম উপযুক্ত পাত্র।

—বেগম সুরাইয়ার সে আশা কি পূর্ণ হয়েছিল?

—না। যদিও তিনি ভেবেছিলেন, বৌদি একবার যে ভুল করেছেন দ্বিতীয়বার নিশ্চয়ই সেই ভুল করবেন না। তাঁর সঙ্গে কনসাল্ট না করে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। সাধারণ সৌজন্য বোধ যার আছে, সে কখনও এত বড় উপকারী ব্যক্তিকে এভাবে অবজ্ঞা করে আঘাত দিতে পারে না—বা এত বড় কৃতঘ্নতার পরিচয়ও দিতে পারে না।

—আচ্ছা, সালেহা বেগম যে বলেছিলেন, ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ পাঠাবেন—তা কি পাঠাতেন?

—আপনি পাগল হয়েছেন! নবাব সাহেব কি কখনও তা নিতেন? কখনই না। তা ছাড়া, সালেহা বেগম টাকাই বা পাঠাবেন

কি করে? জামাই ফারুক তো তখন নবাব ফের্দৌসীর জমিদারির সর্বেসর্বা হয়ে বসেছে। শুধু তাই নয়, একদিন এই টাকা পয়সা সংক্রান্ত কথাবার্তায় জামাই শ্বশুরে তর্ক হচ্ছিলো শাশুড়ী সালেহা, স্ত্রী তনিমা ও ইউসুফের সামনেই। জামাই হঠাৎ নিজের ঘরে গিয়ে বন্দুক এনে শ্বশুরকে সবার সামনে গুলি করে খুন করে।

রবীন বিস্মিত হয়ে বললো—সে কি! কেউ বাধা দিলো না?

—বাধা কে দেবে? সবাই ভয়ে তটস্থ। সবাই আপন আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। কেবল আপন-জনদের সামনেই নয়, ঘটনাটা ঘটেছিল হুমায়ুন সাহেবদের দেশের বাড়ি শ্রীপুরে। বেশ কিছু প্রজাও ভিড় করেছিল, হুমায়ুন সাহেবকে জামাতা ফারুকের তাদের প্রতি অত্যাচার ও জুলুমের নালিশ জানাতে। হুমায়ুন সাহেব প্রজাদের পক্ষ নিয়েই ফারুকের কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন। প্রজারা প্রত্যক্ষদর্শী।

—ফারুকের কোন শাস্তি হয়নি?

—আগেই তো বলেছি, টাকা দিয়ে থানাগুলি সে হাত করে রেখেছিল। সুতরাং খবরটা শহর পর্যন্ত সকলের কানে গেলেও, কোন পুলিস অফিসার এ ব্যাপারে এন্‌কোয়ারি করতে আসেনি বা ফারুকের বিরুদ্ধে কোন কেসও ফাইল করেনি।

—প্রজারা বা ইউসুফ কেন থানায় ডায়েরী করেনি?

—কিছু প্রজা এসে নবাব সুরাবর্দিকে বলেছিলেন, ছোট সাহেব অর্থাৎ ইউসুফ সাহেব যদি একটা কেস ফাইল করতেন আমরা তবে তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিতাম। আমরা তাঁকে বলেও ছিলাম। কিন্তু তিনি ফারুক সাহেবকে ভীষণ ভয় করেন, নিজের জানের ভয়ে পিতৃহন্তাকে কোন শাস্তিই দিলেন না।

—নবাব সুরাবর্দি কি করলেন?

—তিনি ইণ্ডিয়াতে থেকে পাকিস্তানের এ সব ঝামেলার কি-ই বা করতে পারেন? যদি তাঁদের আমলের হাকিম, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট থাকতো, তবে তিনি হয়ত কলকাতায় বসে তা করতে পারতেন।

কন্তু এই সব নওজোয়ানদের তিনি চেনেন না, জানেনও না। তারাও তাঁর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে চেনে না। যেখানে বিচারের নামে চলে প্রহসন, বা আইনগত অনুরোধ যেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়, সেখানে নবাব সুরাবর্দি কখনও তাঁর আর্জি পেশ করেন না।

—জারিনার কথা তো বললেন না। তাঁর কি হল?

—জারিনাকেও বিয়ে দিলেন সালেহা বেগম একটি স্টেটের ম্যানেজারের সঙ্গে। যদিও সালেহা বেগম জানিয়েছিলেন সুপাত্র পাওয়া গেল, তাই জারিনার বিয়েটা দিয়ে দিলাম। বস্তুতঃ বিয়েটা দিয়েছিল ফারুক তারই এক বন্ধুর সঙ্গে। সে চায়নি, নবাব সুরাবর্দির বা বেগম সুরাইয়ার আধিপত্য বেশী দিন তার শ্বশুরবাড়ির উপর থাকে। সে জানত শ্বশুর ও খুড়শ্বশুরের বিপুল সম্পত্তির মালিক সে হয়েছে অন্যায়ভাবে। তাই শালিদের কোন নবাব পরিবারে বা খানদানী শিক্ষিত পরিবারে সে বিয়ে দিতে দেবে না। তাই জারিনার পাত্র সে ঠিক করল অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে—যাতে সেই পাত্রকে সে হাতের মুঠোতে রাখতে পারে।

—বেগম সুরাইয়া বা নবাব এ সম্বন্ধে কিছু বললেন না?

—নবাব বেগমকে বলেছিলেন, তোমার বৌদি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই তোমার ঘাড় দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করিয়ে তাদের সমস্ত খরচ তোমাকে দিয়ে বহন করিয়ে তারপর নিজের খুশী মত আজে বাজে বিয়ে দিয়ে পরিবারের বংশের সুনাম নষ্ট করছেন। তুমি এই ছোট মেয়েটিকে পাঠিয়ে দাও। আমি বলছি সেতারা পুরোপুরি ওর মা'র প্রোটো টাইপ হয়েছে। তনিমা, জারিনা পেয়েছিল তোমার দাদার স্বভাব। সেতারা এইটুকু বাচ্চা, কিন্তু এরই মধ্যে তার স্বভাবের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—তাতে একে রাখা নিরাপদ নয়।

—বেগম সুরাইয়া কি সেতারাকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?

—বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় একজনকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তাই বার বার বৌদির থেকে আঘাত পেয়েও সেতারাকে পাঠালেন না।

—ইউসুফ কি করলেন?

—কি আর করবে? বি. এ. পাস করে কিছুদিন ভগ্নিপতির উমেদারি করেছিল। তারপর বাপ, ঠাকুরদার নাম ভাঙ্গিয়ে একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল। প্রেম করেছিল মধ্যবিত্ত ঘরের এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি প্রেমের খেলায় ওস্তাদ। ইতিপূর্বে সে এক পাইলটের সঙ্গেও প্রেম করে শেষ অবধি তাকে বিয়ে করেনি। তেমনি নবাব বংশের ইউসুফকেও বেশ কিছুদিন নাচিয়ে জীর্ণ বস্ত্রের মত তাকে পরিত্যাগ করে বিয়ে করল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য-মন্ত্রীর পুত্রকে। সেই মন্ত্রীমশায় অবশ্য অতি সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত হতে হামাগুড়ি দিয়ে বুদ্ধির কৌশলে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বহাল হয়েছিলেন। তবে সেই মেয়েটি বুদ্ধিমতী। বিত্তহীন ভূতপূর্ব নবাবের বংশধর হলে কি হবে, একমাত্র চাকরিটি ছাড়া ইউসুফের আর কিছুই নেই—সবই যে ভগ্নিপতি দখল করে নিয়েছে, সে খবর সে জানে। এরা যে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াবার মেয়ে। তাই অতীত অপেক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকেই সে অধিক মূল্য দেয়। তাই সেটিং সানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে রাইজিং সানকে পাকড়াল। কারণ সে মুখ্যমন্ত্রীর একমাত্র পুত্র। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রবধূ হবার সম্মান তাকে বেশীদিন ভোগ করতে হয়নি। কারণ স্বল্প দিনেই শ্বশুর তার গদিচ্যুত হয়েছিল। শুনেছি বাংলাদেশে মুক্তি-সংগ্রামে সে স্বামী পুত্রের সঙ্গে লণ্ডনে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কারণ তার শ্বশুর ও স্বামী ছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিরোধী পক্ষ।

—যাক সেই চতুরা ললনার কাহিনী। আমি জানতে চাই ইউসুফ সাহেবের কথা। তিনি কি হতাশ প্রেমিক হয়ে পড়ে রইলেন?

—না, ইউসুফ তত বোকা ছেলে নয়। অবশেষে সে একজন সরকারী অফিসারের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটি গ্র্যাজুয়েট। দেখতেও আর দশজন মেয়ের মত সাধারণ। কোন দিক দিয়েই নবাব ফেরদৌসীর বংশের পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত নয়। তবে ইউসুফ আজ নবাব নয়। সুতরাং তার উপযুক্তই হয়েছে তার স্ত্রী।

—ফারুকের খবর কি?

—সে পূর্ব পাকিস্তানে শ্বশুরের সম্পত্তি বহাল তবিয়তে ভোগ করছিল। নিজে সে চট্টগ্রাম শহরের বাড়িতে বাস করছিল। যে বাড়িতে ইউনুস সাহেব বাস করতেন, সেই বাড়িতে রেখেছিল তার এক ভাইকে। শুনেছি সেই ভাইয়ের অনেক গুণ।

—তার ভায়ের আবার কি গুণ ?

—শুনেছি সেই ভাই কলকাতায় থাকতে এক সুন্দরী সুগায়িকা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু সেই মেয়েটির হঠাৎ মৃত্যুর রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। যদিও আত্মহত্যা বলে সবাই জানে। শুনেছি ফারুকের ভায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে সে স্বীকার করেছে এটা হত্যা, এবং তারপর হতে সে ইনসেমিনিয়া রোগে ভুগছিল। অনেক ঘুমের পিল খেয়েও নিদ্রাদেবীর শীতল করস্পর্শে সে বঞ্চিত ছিল। সারা রাত নাকি সেই পাপের আগুনে পুড়ে মরেছে। আর সারারাত বিগত স্ত্রীকে নাকি দেখতে পেত, শুনত তার গান।

—ফারুক কলকাতায় আর আসেনি ?

—না সে ভয় করত নবাব সুরাবর্দি ও তাঁর পরিচিত ইনফ্লুয়েনশীয়েল সোসাইটিকে। তাই হীরা চুরির পর সে কলকাতায় পা দেয়নি। তবে সে সর্বত্র বলে বেড়াত নবাব হুমায়ুন ও তস্য ভ্রাতা ইউনুস সাহেবের সব সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছি, বাকী আছে নবাব সুরাবর্দি— তাঁর সম্পত্তিও আমার হাতে আসবে।

ফারুকের ভয়ে বেগম সুরাইয়া নিজেও কখনও পূর্ব পাকিস্তানে কি তাঁর শ্বশুর গৃহে বা পিতৃগৃহে একদিনের জন্যও আসেননি— এমন কি নবাব সুরাবর্দিকেও আসতে দেননি।

বেয়ারা এসে হুইস্কি ও কফি দিয়ে গেল। মিঃ সোম হুইস্কি বোতল থেকে ঢেলে নিয়ে বললেন, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই, নইলে তেমন জোর পাচ্ছি না। আপনিও কফিটা নিন। এক টানা নবাব পরিবারের ইতিহাস শুনতে শুনতে বোধ হয় আপনি বোর ফিল করছেন।

—না, ক্লান্তি তো বোধ করছিই না—বরং বেশ ইন্টারেস্ট পাচ্ছি : এতে আমার কিছু লাভও হবে।

—এ কাহিনী আপনার লেখার কতটা খোরাক যোগাবে জানি না, তবে আমি অন্ততঃ বাইরের একজন কাউকে এসব ইতিহাস শুনিয়ে অনেকটা হালকা বোধ করছি।

খানিকটা চাঙ্গা হয়ে মিঃ সোম আবার বলতে শুরু করলেন—সেতারা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রামে গেল। নবাব ও বেগম মনে করেছিলেন, দিদিদের মত এবার তারও বিয়ে দিয়ে দেবে তার মা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছুকাল পর সেতারা ফিরে এল। সে প্রি-ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হল। কিন্তু তার চলাফেরায় কেমন একটা উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ দেখা গেল। বুদ্ধিমতী বেগম প্রশ্নবাণে বুঝে নিয়েছেন—পূর্ব পাকিস্তানে থাকাকালীন সে ভগ্নিপতির সঙ্গে হব নসি করে বেড়িয়েছে। যার জন্য তার মনের তারুণ্যে জোয়ার লেগেছে। কিন্তু নবাব সাহেবের কড়া নির্দেশে তাঁর কারে তাকে কলেজে যেতে হত ও নির্দিস্ট সময়ে তাঁরই কারে ফিরবার ব্যবস্থা হল।

—কিন্তু যে পালে হাওয়া লেগেছে তা কি ধরে রাখা যায়?

—কথাটা আপনার যথার্থই স্যহিত্যিকের মতই হয়েছে, বেগম যতই রাশ টেনে ধরেন সেতারার মন ততই বিদ্রোহ করতে চায়।

পি.-ইউ. পরীক্ষার পর আবার সে দেশে যেতে চাইল। নবাব ও বেগম বললেন—ওখানে গেলে তোমাকে আর ফিরে আসতে হবে না। যদি বি. এ. পাস করতে চাও, তবে কিছুকালের জন্য দেশের কথা ভুলতে হবে।

সেতারাকে পরিপূর্ণ ভাবে নষ্ট করে দিয়েছে ফারুক। ছেলেদের প্রতি নেই তার কোন বিশ্বাস, ভক্তি বা শ্রদ্ধা। তার ইচ্ছে ছিল এম. এ. পাস করে সে চলে যাবে কোন রকম স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায়। জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে উপভোগ করবার একমাত্র স্থান নাকি আমেরিকা। অর্থ ও ভোগ একেবারে পাশাপাশি—দুটোই যেন হাত ধরাধরি করে চলেছে পাশ্চাত্যের সেই অতি আধুনিকতম সভ্য? দেশে। তাই এম. এ. তাকে পাস করতেই হবে।

—পড়াশুনায় সেতারা কি রকম ছিল?

—মাঝারি ধরনের। খুব একটা ভাল নয়। যাক্ বি. এ পাস করেছে। সে আরও পড়াশুনা করতে চাইল। বেগম সুরাইয়াও ইচ্ছে করলেন অন্ততঃ একটি ভাইঝিও যদি এম. এ.-টা পাস করে। আজকাল ঘরে ঘরে এম. এ., ডবল এম. এ., ট্রিপল এম. এ.-র ছড়াছড়ি। তাঁর ভাইঝি অন্ততঃ একটি এম. এ. যদি পাস করে।

—তবে তো, সেতারা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল।

—বেগম সাহেবার চালে ভুল হল। জারিনা বেচারি দুটি সন্তান নিয়ে প্রাইভেট পড়ে সে গ্র্যাজুয়েট হলো। কিন্তু এম. এ. পড়ার ছুতায় সেতারার উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বেড়ে গেল। ইউনিভারসিটির ক্লাসের ঠিক নেই। তারপর প্রায়ই নানা হুজুক লেগেই আছে। অমুক পার্টির স্ট্রাইক, অমুক পার্টির বক্তৃতা। ক্লাস কতক্ষণ চলছে তার স্থিরতা নেই। প্রায় দিনই নবাব সাহেবের কার ফিরে আসে—শোনে ছুটি হয়ে গেছে, ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসে মারামারি হচ্ছে। বেগম কার পাঠানো বন্ধ করে দিলেন।

—সুযোগের অপব্যবহার নিশ্চয়ই সেতারা করেনি!

—তবে আর কি বলছি? সুযোগের পূর্ণ অপব্যবহার করেছে। কোথায় কার সঙ্গে যাচ্ছে, সত্যি, কিছুই সে বলত না। যে বন্ধুর বাসায় গেছে বলে সে আন্টিকে বলেছিল, পরে বেগম সাহেব ফোন করে জানলেন যে সেই বন্ধুর বাড়িতে আদৌ যায়নি। বেগম মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। কোন অঘটন ঘটলে দায়ী হবেন তিনিই। একান্তে বসে তিনি যখন নবাবের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে পরামর্শ করছেন, তখন ব্যাপারটা ক্লাইমেক্সে উঠেছিল।

—কি করেছিল সেতারা?

—সকালে ব্রেকফাস্ট করে সে বলল, আন্টি, আমি লাইব্রেরীতে যাচ্ছি কিছু নোট করতে। এ সব বই তো আউট অফ প্রিন্ট, তাই আমাদের প্রফেসার বলেছেন, যেন লাইব্রেরীতে এ সব পড়ে নিই।

—বেগম প্রশ্ন করলেন, কখন ফিরবি?

—বেশী দেরি হবে না। লাঞ্চের আগেই ফিরে আসব।

এদিকে লাঞ্চের টাইম ওভার হল, বিকেলের টি টাইম গেল, এমন কি রাত্রের ডিনার টাইমও পার হয়ে গেল। সেতারার দেখা নেই। ওদিকে বেগম সুরাইয়া তো হন্যে হয়ে এখানে সেখানে ফোন করছেন। নবাব বিরক্ত হয়ে ফরমান জারি করলেন—পরের মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে এখন কোন্ বিপদে পড়তে হবে ভগবান জানেন। তিনি বেগমের কোমল মতি, অত্যধিক স্নেহপ্রবণতার জন্য তাঁকে তিরস্কার করতে থাকেন। বেগম নীরবে অশ্রুধারা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছছেন, আর এলোপাথাড়ি যত্রতত্র সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য জায়গায় সেতাবার খোঁজ করছেন। উদ্বিগ্ন দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অবস্থা দেখে আমারও ভারি খারাপ লাগছিল। ঘড়ির কাঁটা যত ছুটে চলল, ততই যেন বেগমের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। অনাগত বিপদের বিভীষিকা যেন জ্বলন্ত ভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখতে পেলেন। নবাবও বুঝে উঠতে পারছেন না, কি করবেন। পরিবারের কেলেঙ্কারী প্রকাশ হবার ভয়ে থানায় ফোন করেননি। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তাও করতে হবে। দুজনারই কারোরই রাতের খাওয়া হল না। দুটো টেলিফোন সামনে নিয়ে দুজনে বসে আছেন। নবাব বেগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের অন্যান্য পরিচারক পরিচারিকা সকলেই নিদ্রা ছেড়ে বসে বসে নানা জল্পনা কল্পনা করছে। কেউ এই ছোট মেম-সাহেবকে পছন্দ করে না তাদের প্রতি তার রূঢ় ব্যবহারের জন্য। তাই তারাও সেতারার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করত।

এমন সময় একটা ট্যাক্সি হতে সেতারা নেমে সোজা উপরে উঠেই যেন কিছুই ঘটেনি তেমনি ন্যাকামির সুরে বলল—আন্টি, আই এম ভেরি হাংরি। সেই সকাল থেকে একটানা নোট করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে।

বেগম তো সেতারাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু নবাবের ভয়ে কোন রকম আদিখ্যেতা দেখাতে সাহস করলেন না।

উঠে এলেন নবাব। বললেন—কোথায় তোমার নোট বইটা দেখি?

সেতারা তখন ব্যাগ খুলে বলল—ঐ যাঃ, সারাদিন কষ্ট করে নোট করলাম, ট্যাক্সিতে ভুলে ফেলেই এসেছি।

নবাব সাহেব জীবনে যা কখনও করেননি—উচ্চ পর্দায় গলা তুলে বললেন, শাট্ আপ। আর মিথ্যে কথা বলে আমাদের বোকা বানাতে চেষ্টা করো না। তোমার মুখ থেকে ড্রিংয়ের গন্ধ পাচ্ছি। তা ঢাকবার জন্য তুমি মশলা খাচ্ছ। কিন্তু আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। বিকেল ৫টার সময় লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে গেছে। আমি নিজে সেখানে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তুমি সেখানে কখনও কোনদিনই যাওনি। স্রেফ অল এ্যালং তোমার আন্টিকে ধোঁকা দিয়ে কোথায় তুমি হব নবিং করে বেড়াচ্ছ। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু লিসেন এ সিংগেল ওয়ার্ড ফ্রম ইউ। নাও ইট ইজ কোয়াটার টু টুয়েলফ্।

নবাবের সেই অভূতপূর্ব মূর্তি দেখে আমরাই সেদিন শঙ্কিত হয়েছিলাম। নবাব সাহেবকে এ রকম রাগতে কেউ কখনও দেখেনি। সেতারার জন্য সে রাত্রে আমারও আমার বাড়িতে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি।

বেগম উঠে বেয়ারাকে দিয়ে সব খাবার গরম করে সেতারাকে খেতে ডাকলেন। কিন্তু সেতারার ফেলে ছড়িয়ে খাবার নমুনা দেখেই বোঝা গেল সে মোটেই অভুক্ত নয়। বরং খাওয়াটা যেন তার নেহাৎ কষ্টকর মনে হচ্ছিল। এদিকে নীচে নবাবের অফিস রুমে বসে ফোনে আমাকে দিয়ে নবাব তখনই পাকিস্তান এয়ার ওয়েজে সেতারার নামে একটা সিট তার পরদিন দশটার ফ্লাইটে বুক করে রাখলেন। সকাল আটটার মধ্যে আমি টাকা ও তার পাসপোর্ট দিয়ে টিকিট কালেক্ট করে আনব এই বন্দোবস্ত হল।

সে রাত্রে এই বিষয়ে বেগম ও সেতারাকে কিছুই জানানো হল না। ভোরেই নবাব বেগমকে বললেন—সেতারার যাবতীয় কাপড়-জামা প্যাক করে দাও। চা খেয়েই আমি তাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাব। এ সম্বন্ধে ট্রাঙ্ক কল করে তার ভাইকে কালই আমি সব জানিয়ে দিয়েছি যে—এই মেয়েকে যেন ভবিষ্যতে আর কখনও আমার

বাড়িতে না পাঠায়। এবং কাল ১০টার ফ্লাইটে সে চট্টগ্রামে যাচ্ছে।

নবাবের নির্দেশে বেগম সেতারার কাপড়-জামা প্যাক করে রাখলেন। কোন বই খাতা দিতে নবাব বারণ করেছিলেন। কারণ এখানকার বই ওখানকার ইউনিভার্সিটিতে লাগবে না। তা ছাড়া পড়াশুনা একটা অছিলা, সে জীবনটাকে এনজয় করতেই কলকাতায় এসেছিল। ফারুকই যে সেতারাকে নষ্ট করেছে, বুঝতে তাঁর বাকি ছিল না।

সেতারা ঘুম থেকে উঠে ব্রেক ফাস্ট টেবিলে বেশ ফ্রেশ হয়ে এল। তার মুখের ভাবে এতটুকু দুঃখ, অনুতাপ বা অনুশোচনার চিহ্ন দেখা গেল না। যেন কিছুই ঘটেনি। বরং আবহাওয়াকে সে খানিকটা সহজ করবার চেষ্টা করছিল।

বুদ্ধিমান নবাব সাহেব জানেন স্নেহময়ী স্ত্রী কখনও সেতারার প্রতি এই কঠিন শাস্তির কথা মুখ ফুটে বলতে পারবেন না। তাই তিনি নিজেই বললেন—সেতারা ভাল করে খেয়ে নাও। তোমার প্লেন রিচ করতে হয়ত বেলা হয়ে যাবে। তুমি আজ ফর গুডের জন্য চাটগাঁয় চলে যাচ্ছ। টিকিট করা হয়ে গেছে। তোমার দাদাকেও ফোনে জানিয়ে দিয়েছি। ব্রেকফাস্ট শেষ করেই তুমি রেডি হয়ে নাও।

কিন্তু আনকেল আমি তো এখন যেতে পারি না। সামনেই আমার এগ জামিন। তা ছাড়া এই অল্প সময়ে কি করে রেডি হব?

তোমার ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটিতে আর পড়া হবে না। তুমি চাটগাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাড্‌মিশন নিও। তাছাড়া সবেমাত্র মাস দুই হয়েছে তুমি অ্যাড্‌মিশন নিয়েছ—এখন কোন রকম পরীক্ষাই তোমার হোতে পারে না। অ্যাট্‌ লিস্ট নট্‌ বিফোর ওয়ান ইয়ার, কোন পরীক্ষার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, তোমার সব কিছু তোমার আন্টি রেডি করে রেখেছেন। একসেপ্ট ইয়র বুকস উইচ্‌ আর নট নেসেসারী ফর ইউ দেয়ার। এবার তোমার পোশাকটা বদলে যেতে পার। যদি না চাও—তবে যা পরে আছ, তাই পরেই যেতে হবে।

সেতারা জানে আনকেল আন্টির মত নরম বা কোমল নন। তিনি যা স্থির করবেন তার কিছু নড়চড় হবে না। অগত্যা নবাবের আদেশ শিরোধার্য করে তাকে ইণ্ডিয়া ছাড়তে হল। এমন পরিণতি হবে সে কল্পনা করতে পারেনি। ভেবেছিল প্রতিদিনের মত ব্লাফ দেওয়া যাবে। বরং সারাদিন খাওয়া হয়নি শুনে আন্টি খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, অন্য দিকে তাঁর মনই যাবে না। কোন দিনও এতক্ষণ নবাব জেগে থাকেন না। সেদিনের রাতও যে অনেক হয়েছিল—সেটাও তার খেয়াল ছিল না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রবীন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি এবার উঠি।

মিঃ সোম বললেন—হ্যাঁ, আজ অনেক রাত হয়েছে। আজ আমার ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে বলে তিনি ড্রাই-ভারকে ডেকে রবীনকে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

৮

কয়েকদিন পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে রবীন এসে উপস্থিত হল। রমার সঙ্গে এসেই দেখা। সে হেসে হাত তুলে নমস্কার করে বলল—আজ আপনার বন্ধুর চিঠি এসেছে দাদুর কাছে। অবশ্য তাঁর নতুন সম্পত্তি সংক্রান্ত কি সব ব্যাপার। আপনার কথাও আছে। আপনার বই-এর ম্যাটার কমপ্লিট হয়েছে কিনা ইত্যাদি। আমার সঙ্গে বা দাদুর সঙ্গে দেখা না করে যেতে হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

—হ্যাঁ আমিও তার চিঠি পেয়েছি। আমার গল্পের বিষয়বস্তু নেওয়া শেষ হয়েছে কিনা জানতে চেয়েছে। আর লিখেছে আমার বই হতে এই নবাব বাড়ির গল্প পড়বে। খানিকটা হেসে রবীন বলল—জানেন আমার এই বন্ধুটি বছরের মধ্যে আট মাস বিদেশে থাকলেও ভীষণ সুপারস্টিসাস্।

—তাই নাকি? ইট্‌ ইজ স্ট্রেঞ্জ! কেন বলুন তো?

—এই যেমন নবাব পরিবারের তিন ভাই-এর অপমৃত্যু শুনে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমায় বলেছিল যদি কোন অপমৃত্যু এ বাড়িতে ঘটে থাকে—তবে আমি এ বাড়ি কিনব না।

রমা হেসে প্রশ্ন করল—কেন ভূতের ভয়ে নাকি?

—ভূত নয়, তবে অতৃপ্ত কোন অশরীরী আত্মার উপস্থিতির কথা কলকাতার অনেক পুরানো বাড়ি সম্বন্ধে শোনা যায় তো?

উভয়ের কথোপকথনের মাঝখানে মিঃ সোম ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন—কি নিয়ে আলোচনা করছিস দিদিভাই? এই যে মিঃ সেন, আপনি কয়দিন আসেননি—কি ব্যাপার, শরীর সুস্থ আছে তো?

—শরীরটাই খারাপ হয়েছিল। তাই কয়দিন আসা সম্ভব হয়নি।

—শরীরেরই বা দোষ কি বলুন? এই বৃদ্ধের পাল্লায় পড়ে রোজ অত রাত করে বাড়ি যাওয়া।

—না না, আপনি সে জন্য চিন্তা করবেন না। আমাদের মত সাংবাদিক সাহিত্যিকদের রাত বেরাত বলে কোন কথা নেই। কতদিন কত রাত করে অফিস হতে বাসায় ফিরতে হয়। তা নয়। এটা মাঝেমাঝেই বিকল হয়ে যায়।

রমা বলল—শরীরের যত্ন নিশ্চয়ই নেন না, তাই এমন হয়। তারপর দাদুর কথার উত্তরে সে বলল—জানো দাদু, মিঃ রায়ের নাকি ভীষণ ভূতের ভয়, তাই উনি বলছিলেন।

—ভূতের কথাই যদি বললি, তবে এই সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি। ভয় পাবেন না তো?

—না না, আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ভূত-প্রেতের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও এসব ছেলে ভুলানো গল্প বিশ্বাস করি না, ভয় তো দূরের কথা।

—তবে শুনুন। নবাব ফের্দৌসীর জীবিতাবস্থায় তখন সবে আমি বাবার সঙ্গে নবাব বাড়িতে আসা-যাওয়া করছি। কোন একদিন কি একটা কাজে এক রাত্রে নবাব সাহেব বাবাকে ডেকে পাঠালেন।

সঙ্গে বাবা আমাকেও আনলেন। তবে আমাকে ভেতরে না নিয়ে স্নিগ্ধচ্ছায়ার বাগানে বসিয়ে রেখে গেলেন।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় অপূর্ব লাগছিল বাগানটা। তারই মধ্যে শ্বেত পাথরের মূর্তি, বসবার জন্য শ্বেত পাথরের বেঞ্চি। সে যেন এক ঐশ্বরিক সৌন্দর্য—যার বর্ণনার ভাষা আমার নেই। আমি নিজেই বাবাকে বলেছিলাম—আমি এখানে বসবো। ঐ বাগিচার এক পাশে একটা বাঁধানো ইঁদারাও ছিল। আমি সেই ইঁদারার অনতিদূরে বসেছিলাম। হঠাৎ ঝম্ ঝম্ নূপুরের আওয়াজ শুনলাম। প্রথমে আমি ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম। এই নির্জন রাতে নূপুর পায়ে কে এখানে আসছে। খুবই অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম এই ভেবে যে—যদি কোন বেগম এসে পড়েন, তবে আমাকে এত রাত্রে এখানে বসে থাকতে দেখে তিনি কি ভাববেন। চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম—না, কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই। কিন্তু কেবল নূপুরের ধ্বনি নয়, কে যেন নৃত্যের তালে তালে নূপুরধ্বনি করে এগিয়ে আসছে। কিন্তু শব্দ ছাড়া চাক্ষুষ কোন কিছু দেখবার অবকাশ আমার হয়নি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে নূপুরধ্বনি যেন আস্তে আস্তে ইঁদারার জলে মিলিয়ে গেল। আমি উঠে ইঁদারার পাশে গিয়ে ঝুঁকে ইঁদারায় দেখতে যেন এক সঙ্গে কয়েকটি মেয়ের কলহাস্য শুনতে পেলাম। তখন সবে কিশোর, তাই ভয়ে সরে এসে আবার গিয়ে বসলাম যেখানে বসেছিলাম। আবার তেমনি নূপুরধ্বনি, আবার কলহাস্য। আমাকে বেশ বিভ্রান্ত করে তুলল। এটাকে আপনারা হ্যালুসিনেশন বলতে পারবেন না। কারণ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে সজাগ থেকে এইভাবে শুনলাম পুরো একটি ঘণ্টা। ফিরবার পথে বাবাকে বলেছিলাম। তিনি বললেন—হ্যাঁ, নিশিথ রাতে ঐ বাগানে ঐ রকম শোনা যায় বলে লোকে বলেছে। নানা জনে নানা কথা বলেন। কেউ কেউ বলেন, মুসলিম রাজত্বে যে মোগল বাদশা এখানে ছিলেন—তাঁরই হারেমের কোন অতৃপ্ত বাইজির অপমৃত্যু বোধ হয় ঘটেছিল ঐ ইঁদারায়, তাই এমন শোনা যায়।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম—কিন্তু একটি নারীর কলহাস্য তো নয়, এ যে অনেক নারীর কলহাস্য।

বাবা উত্তরে বলেছিলেন—হয়ত একাধিক বাইজির অপমৃত্যু ঘটেছিল ওখানে, তাই এমন শোনা যায়, তবে যাঁরা এ প্রাসাদে বাস করে অভ্যস্ত হয়েছেন, তাঁরা এসবে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। তবে শুনেছি, ফারুকের ভাই বেশী দিন ঐ প্রাসাদে থাকতে পারেনি। সে-ও নাকি ঐ রকম শুনে ভয় পেত, যার জন্য সারা রাত সে ঘুমাতে পারত না। যদিও লোকের কাছে সে বলত সে তার মৃত স্ত্রীকে দেখে। বস্তুতঃ আমি যা শুনেছি, সে-ও তাই শুনতো।

আর এক নাম করা ভূতের গল্প শোনাচ্ছি। চাটগাঁ বা চট্টগ্রামে বদর সাহেব নামে এক ফকির ছিলেন। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম কিংবদন্তী আছে। সে সব বলতে গেলে আপনার আর একটা উপাদান হবে। আজ অত কথার প্রয়োজন নেই। আপনাকে জানাচ্ছি সেই বদর সাহেব সংক্রান্ত একটি মাত্র গল্প। শুনেছি চট্টগ্রাম শহরে পূর্বে অর্থাৎ আমার ঠাকুরদার আমলে নির্জন নিস্তব্ধ রাতে প্রায় যত্রতত্র দেখা যেতো ৭' ফিট লম্বা এক আকৃতি সর্বাঙ্গ কালো আলখাল্লায় ঢেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই মূর্তিকে দেখে কেউ যদি তিনবার তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার বা সেলাম না জানাত, তবে হিন্দু-মুসলিম ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যিনিই হোন না কেন সংজ্ঞা হারিয়ে সেই জায়গায় পড়ে থাকতেন। উনি কারও ক্ষতি করতেন না। তবে তাঁকে অসম্মান করবে কেউ, তাও তিনি সহ্য করতেন না। শোনা যায় সকলেই তাঁর দেখা পেতেন না। পুণ্যাত্মা ব্যতীত তিনি হিন্দু-মুসলিম কাউকে দেখা দিতেন না। হিন্দু মুসলিম সবাই তাঁর দরজায় মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে থাকে। এটাকে আপনারা ইচ্ছা করলে ভূত বলতে পারেন। কারণ তাঁর মৃত্যু হয়েছে কত শত বছর আগে, আমার তা এখন মনে পড়ছে না।

রবীন বলল—এমন ভূতুড়ে গল্প আমিও শুনেছি। শুনেছি হেস্টিং হাউসে প্রতি রাত্রে ঐ হোস্টেলের আবাসিকরা গভীর রাত্রে ঘোড়ার

খুরের শব্দ শোনে—যেন একদল ঘোড়া ছুটে আসছে। শোনে আর্ত পুরুষের কান্না। কেউ কেউ বলে রাজা নন্দকুমারের আর্ত স্বর। এমনি আরও কত। কিন্তু এ সব আমি বিশ্বাস করি না।

—ভূত আমিও বিশ্বাস করি না। তবে মৃত অতৃপ্ত আত্মা যে এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে যেতে পারে না, সে কাহিনী আমি অনেক শুনেছি। যাক, আজ আমাদের গল্পের বিষয়বস্তু হতে অনেক দূর সরে গেলাম।

রমা বলে উঠল—তামরা দাদু, সব আদ্যিকালের ভূতের গল্প শোনালে। আমি তোমাকে হালের এক ভূতের গল্প শোনাচ্ছি। আমার এক কলিগের বৌদির বোনের গল্প। একদিন বৌদি, তাঁর বোন, বোনের তিন বছরের এক শিশু ও দুই বোনের স্বামী কুটুম বাড়ি হতে বেড়িয়ে ট্যাক্সি করে ফিরছিল। সামনে আসছিল একটি লরি। দুটোর মধ্যে সংঘর্ষে ট্যাক্সিটা খুব খারাপ ভাবে জখম হল—যাত্রী সবাই ছিটকিয়ে চারদিকে পড়লো। সকলেই অল্প বিস্তর আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু তিন বছরের শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে বৌদির বোন মারা যান। তারপর থেকে প্রতিদিন রাত সাড়ে দশটায় যে সময় ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক সেই সময় বৌদির বোন যে শাড়ি পরে মারা গিয়েছিলেন —সেই রকম শাড়ি পরে একটি মহিলা এসে বলে আমার ঝুনু কোথায় গেল? আমার ঝুনু? আমার ঝুনুকে হাসপাতালে একবার নিয়ে এস। মেয়েটির মুখ দেখা যায় না। কেউ প্রশ্ন করতে গেলে আর তাকে দেখা যায়। কথাটা তাঁর আত্মীয়দের কানে গেছে। দূর থেকে তাঁরা এসে দেখেছেন সত্যি তিনি বৌদির বোন। কিন্তু তিনি ঐ কয়টি ছাড়া অন্য কোন কথা বলেন না বা কারো প্রশ্নের উত্তর দেন না। স্বল্প সময়ের জন্য ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নাকি তাঁকে দেখা যায় না। উনি নাকি মেয়েকে খুব ভালবাসতেন। হাসপাতালে মারা যাবার আগে তাঁর মেয়েকে দেখতে চেয়েছিলেন। মেয়ে মা'র সর্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ঐ চেহারা দেখে ভয় পাবে বলে মেয়েকে দেখানো নাকি হয়নি। তাছাড়া মেয়েরও নাকি তখন খুব জ্বর। এটা হালের খবর। একে আমি ভূত বলব না। বলবো কোন মাতৃ হৃদয়ের সন্তানের জন্য

আকৃতি। যাক্, আর বেশীক্ষণ আপনাদের সময় নষ্ট করব না। এবার আমি উঠি। আপনি চা খাবার খেতে খেতে গল্প শুনুন।

—আপনারা আমাকে ঋণী করে রেখেছেন।

রমা হেসে বলল—একদিন আপনার বাসায় যেয়ে খুব খেয়ে আপনার ঋণের শোধ তুলে আসব। তা ছাড়া, আপনার বন্ধু একাই তো আপনার এক মাসের ঋণ শোধ করে গেছেন।

মিঃ সোম তাঁর হুইস্কি ঢেলে বললেন—তোমরা চলে যাবার অল্প কিছু দিন পরই বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল। সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যা, মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার, শিশু নিধন কিছুই বাদ গেল না। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নারকীয় ঘটনা কম শোনা যায়। পূর্ব পাকিস্তানী অর্থাৎ বাঙ্গালী ভার্সেস পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থাৎ পাঞ্জাবী। যদিও পূর্ব পাকিস্তান বাঙ্গালীরা সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে পাঁচ ছ' গুণ বেশী তবু পশ্চিমীরা পূর্ব পাকিস্তানী বা বাঙ্গালীদের উপর কর্তৃত্ব করবার নেশা ছাড়তে পারেনি। মানচিত্রের দুই সীমান্তে অবস্থিত এই দুই রাজ্য। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্বের প্রাকৃতিক সম্পদের বিনিময়ে পশ্চিম সমৃদ্ধ হচ্ছিল। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ বিশ-বাইশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের দারিদ্র্য ঘুচায়নি। তারা উত্তরোত্তর দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হচ্ছিল। পশ্চিম ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। পূর্ব আক্রোশে ফুঁসতে থাকে। বুলেটের জোরে পশ্চিম পূর্বের ন্যায্য দাবি উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর হল। যে বাঙ্গালী জাতিকে দুর্বল মনে করে তাদের উপর নরমেধ যজ্ঞ শুরু করেছিল, সেই বাঙ্গালী যাদের ভয়ে বৃটিশ রাজ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল—তারা যখন স্বজাতির মধ্যে বিভেদ ভুলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াল, তখন পশ্চিমের পূর্বের উপর আধিপত্য করবার খোয়াব টুটে গেল।

বাঙ্গালীদের সেই মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদ মীরজাফরের দল কম ছিল না—যারা বাঙ্গালীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পশ্চিমবাসীদের সহায়তা করেছিল—যাদের বলা যায় ঘরের শত্রু

বিভীষণ—তারা স্বাধীনতা চায়নি। পূর্ব পাকিস্তানে যে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী মুসলিম সরকারী চাকুরিতে ভাল পজিশনে ছিল, তারা পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্নতার বিরোধী ছিল।

ফারুক ছিল সেই মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীদের অন্যতম। সে-ও বিভীষণের মতই শত্রুদের দেখিয়েছে মুক্তি সংগ্রামীদের গুপ্ত ঘাঁটি। দেখিয়ে দিয়েছে মুক্তি সংগ্রামের দেশপ্রেমিক লীডারদের-যাঁদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে পরিশেষে হত্যা করা হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ যখন ভয়াবহ আকার নিল, পশ্চিমী মিলিটারীদের নৃশংস বর্বরতা তত বেড়ে যেতে লাগল। বাঙ্গালীরাও মরণ-পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঙ্গালীদের প্রচণ্ড আক্রমণে তখন পশ্চিমীরা পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। ফারুকের মত বিশ্বাসঘাতকের দলও অবস্থা সঙ্গীন দেখে পাত তাড়ি গুটিয়ে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে বাঁচল।

—আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারব না। কারণ কেবলমাত্র বাঙ্গালীদের আক্রমণে পশ্চিম পাকিস্তানীর সুশিক্ষিত মিলিটারী রেজিমেন্ট পর্যুদস্ত হয়নি। বাংলা দেশকে মুক্ত করতে ভারতের হাজার হাজার সৈনিক প্রাণ দিয়েছে শুনেছি। মুজিবর রহমান নিজেও তাঁর বক্তৃতায় স্বীকার করেছিলেন ভারতের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। কারণ ভারতের পঞ্চাশ হাজার সৈনিকের রক্ত-ক্ষয়ের ফলে সার্থক হয়েছে তাদের মুক্তি সংগ্রাম। ভারতের ট্রেইণ্ড মিলিটারীর সহায়তা যদি না পেতো, তবে আনাড়ী বাঙ্গালীরা কখনই পশ্চিমীদের দক্ষ মিলিটারীদের আপ্-টু-ডেট যন্ত্রপাতির সঙ্গে যুঝতে পারতো না। ইণ্ডিয়ার এই গোপন যুদ্ধে হাজার হাজার সৈনিক প্রাণ দিয়েছে। ভারতের এই ক্ষতি অপূরণীয়।

—কেবলমাত্র মিলিটারী নয়। শুনেছি অনেক রিটায়ার্ড মিলিটারী ডাক্তার, নার্স প্রভৃতিও বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামে গিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেক দক্ষ ডাক্তার, নার্স আর ফিরে আসতে পারেননি। তাঁরাও সেখানে প্রাণ হারিয়েছেন।

—পশ্চিম পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করার পর ভারত যখন যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন ভারতের সুবিধা হল। সম্মুখ যুদ্ধে খুব বেশী ভারতীয় সৈনিক মারা যায়নি। কিন্তু নয় মাস গুপ্তভাবে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছিল অনেক ভারতীয় সেনাকে।

—আপনার কথা সত্য মিঃ সেন। ইণ্ডিয়া ওয়ার ডিক্লেয়ার করার দেড় মাসের মধ্যেই তো বাংলা দেশ স্বাধীন হয়ে বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করল। একটা কথা আমার এই বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত মস্তিষ্কে ঢোকে না, কেন ইণ্ডিয়া অহেতুক তার তাজা পঞ্চাশ হাজার সৈনিকের জীবন বলি দিল বাংলা দেশের যুদ্ধে।

—পূর্ব পাকিস্তান থাকা কালীন, পাকিস্তান সরকার সর্বদা ওয়ারের থ্রেট দিতো। ভারতকে সব সময় এক টেনশনে থাকতে হোত। যদিও ভারত জানতো পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে কখনই জিততে পারবে না। তাই পূর্বাঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্যই বোধ হয় এভাবে এত হাজার হাজার ভারতীয় জোয়ানদের প্রাণ দিতে হলো।

—ভারতের সে আশা কি পূর্ণ হয়েছে?

—না, তা কখনও হবে না। কারণ এটা তো প্রবাদবাক্য যে, উপকারী ব্যক্তি উপকারীর ঋণ স্বীকার করে না, বরং তাকে নানাভাবে হেনস্তা করতে চেষ্টা করে। বাংলা দেশ তার ব্যতিক্রম কিছু নয়।

—যাক্, আমাদের পুরানো প্রসঙ্গে আসা যাক। ফারুক কি একাই পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন?

—না, সে সপরিবারেই পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিল। ফারুক বাংলা দেশ ছেড়ে যাওয়াতে ইউসুফ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ফারুকের জন্য মুক্তি ফৌজের দল নবাব ফের্দৌসীর গ্রামের বিরাট প্রাসাদ, ও 'স্নিগ্ধচ্ছায়ার' বাড়িটা বোমায় ক্ষতবিক্ষত করেছিল। অবশ্য চট্টগ্রাম শহরের বাড়িটাতে সালেহা বেগম ও ইউসুফ ছিল। তাঁরা বাহ্যতঃ শান্তশিষ্ট নিরীহ। তাছাড়া, নবাব ফের্দৌসীর প্রতি চট্টগ্রাম-বাসীর শ্রদ্ধা ছিল। বিশেষ করে হুমায়ুন সাহেব ও ইউনুস সাহেবের

অস্বাভাবিক অকাল মৃত্যুতে দেশবাসীর এই পরিবারের প্রতি সমবেদনা সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তাদের আক্রোশ ছিল ফারুকের উপর। তাই ইউসুফ, সেতারা ও সালেহা বেগম নিরাপদে সুস্থই ছিলেন।

ইউসুফ তখন একটা সরকারি পদস্থ চাকরি করত। সে তাদের পৈত্রিক বাড়িগুলি মেরামত করল। জারিনা তখন চট্টগ্রামে থাকত। চা বাগিচার চাকরি ছেড়ে ফয়েজ চট্টগ্রামে ব্যবসা করছিল। বিদেশে চা রপ্তানির ব্যবসায় তার প্রচুর লাভ।

দীর্ঘকাল পর নবাব সুরাবর্দি ও বেগম সুরাইয়া নিশ্চিন্তে তাঁদের পৈত্রিক ও শ্বশুরালয়েব অবস্থা দেখবার ইচ্ছায় স্বাধীন বাংলা দেশে বেড়াতে গেলেন। বেশ কয়েক দিন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে স্ফূর্তিতেই কাটালেন।

জারিনার দুটি শিশুপুত্র। নিষ্পাপ ফুলের মত জারিনার মুখটা যেন ভোরের বাসি ফুলের মত সর্বদা কি এক বিষাদ ছায়ায় ঘেরা। আন্টিকে দেখে খুব খুশী। সে যেন ফিরে পেয়েছিল তার কৈশোরের আন্টির স্নেহচ্ছায়ার সেই সুন্দর কয়েকটা বছর। জারিনা বরাবরই স্বল্পভাষী, নম্র, বিনয়ী, সে যেন নিজেকে আরও সঙ্কুচিত করে নিয়েছিল। কিন্তু আন্টিকে পেয়ে তার যেন শতদল উন্মেষিত হল।

কিন্তু জারিনার পরিবর্তন বুদ্ধিমতী বেগম সুরাইয়ার চোখ এড়াতে পারল না। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, কোথায় হিসাবে ভুল হয়েছে। তিনি জারিনাকে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে, ফয়েজকে পেয়ে কি তুই খুশী নোস?

নিজের দুঃখ চাপা দিয়ে জারিনা উত্তর দেয়, কেন আন্টি? সে তো ভালই। দেখ আমার টুক্‌টুক্‌ ও টুকু কেমন সুন্দর হয়েছে। সারাদিন ওরা দুটি আমাকে ডুবিয়ে রাখে ওদের খেলা ও গল্পর মধ্যে।

বেগম সুরাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে জারিনার দিকে তাকিয়ে বললেন তোর টুক্‌টুক্‌ ও টুকু তোরই মত সুন্দর। এক তাল সোনার মত সুন্দর ছেলে হয়েছে। দেখতেও ওরা তোরই মত। কিন্তু তোর মত শান্ত নয়। তা ভাল। ছেলেরা বেশী শান্ত হওয়া ভাল নয়। কিন্তু

পেয়ে বোর্‌খা খুলে—বে-আব্রু হয়ে বেশ উড়নচণ্ডী হয়েছে। তাদের দেখে শিখছে।

—না ভাবি, এ ভাবে তুমি সেতারার ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পার না। রাশ তোমার টেনে ধরা উচিত। এমনিতেই তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ। তাড়াতাড়ি কোন খানদানি বংশের ছেলের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা কর।

—আমারও কি সে সাধ হয় না? কিন্তু মেয়ে আমার কাউকেই পছন্দ করবে না। রাতদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়ত তোমার দাদা থাকলে এমন হত না।

—না মিয়া, ভাইকে সে কখনই মানত না। তুমি আমাদের সংসারে যে বিষ বৃক্ষ রোপণ করেছে, তার জন্য তনিমার জীবন জারিনার জীবন তো নষ্ট হয়েছে। সেতারা বোধ হয় একস্ট্রিমে যাবে। যা ভাল বোঝ কর। দেখ, যেন কোম কেলেঙ্কারী না করে বসে। সেতারাকে আমি বিশ্বাস করি না। তার পক্ষে সবই সম্ভব। দেখ নবাব ফের্দৌসীর বংশে যেন কোন কলঙ্কের ছাপ না পড়ে।

—বেগম সুরাইয়ার এমন আশঙ্কার সালেহা বেগম কি আমল দিয়েছিলেন?

—বেগম সালেহা কি করেছিলেন জানি না। তবে সেতারার বিয়ে আজও হয়নি বা হবে না কখনও। নবাব ও বেগম ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়।

এমন সময় রমা ঘরে ঢুকে বলল, দাদু, তুমি করছ কি? রাত ১২টা বাজে। মিঃ সেনের আজ বড্ড দেরি করে দিলে। বাসায় হয়ত ভীষণ বকুনি খেতে হবে।

হেসে রবীন উত্তর দিল না, আমাকে শাসন করবার মত তেমন কেউ নেই। অবশ্য একেবারে নেই বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। পৈত্রিক আমলের বৃদ্ধ রামচন্দ্র আছে, যাকে আমরা রামুকাকা বলি, তার শাসন বরদাস্ত করতে হয়। সেই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে আমাকে। তা ছাড়া আর কোন আত্মীয় নেই।

মিঃ সোম নীরবে সব শুনে বললেন, কেন বৌমা, ছেলেমেয়েরা সব কোথায়? মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে বুঝি?

হেসে রবীন উত্তর দিল, এ পাট এখনও হয়নি। আমি সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষ।

—রমা হেসে বলল, কেন এই উদাসীনতা? ব্যর্থ প্রেমিক না? হতাশ প্রেমিক বা কারো বিরহ জ্বালায়?

—হেসে উত্তর দিলেন, আপনার কল্পনার কোনটাকেই মর্যাদা দিতে পারলাম না। আমাদের মত গরিব জার্নেলিস্ট বা সাহিত্যিকদের বিয়ের বিলাসিতা সাজে না।

—তবে আপনি কি বলতে চান, যারা সাংবাদিক বা সাহিত্যিক তারা সবাই চিরকুমার থাকে?

—তা কেন? সবার অবস্থা তো আমার মত নয়। তা ছাড়া হয়ত মা, দিদি বা ছোট বোন কেউ একজন যদি থাকতেন তবে হয়ত এই আয়েতেও আমার ঘাড়ে বোঝা চাপানো হত। যাক সেদিক থেকে মুক্তি পেয়েছি।

—মিঃ সোম বললেন, তবে এত রাতই যখন হয়ে গেছে, আজ আপনি আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে যান।

রবীন হাত জোড় করে বললেন, এ ব্যাপারে যত রাতই হোক, আমি আপারগ। আমার জন্য এখনও দুজন উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে আছে।

রমা বলল, এই যে বললেন আপনার রামুকাকা ছাড়া আর কেউ নেই এই ত্রিসংসারে। তবে আর একজন কে হলেন?

রবীন হেসে উত্তর দিল, কথাটা আমি মিথ্যে বলিনি। রামুকাকা ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানব আমার জন্য প্রতীক্ষা করে না।

—তবে অপর জন কে?—উৎসুক মুখে প্রশ্ন করে রমা।

—সে আমার অতি অনুগত বিশ্বস্ত এ্যালসেশিয়ান কুকুর "জয়"।

কলহাস্যে রমা বলল, "জয়" বুঝি সবার মন জয় করে?

—একজাক্টলী সো। তাই তো ওর নাম "জয়"। প্রথম প্রথম যারা কুকুর দেখে ভয়ে দূরে সরে থাকে, তৃতীয় দিনে তাদের থেকে সে আদর কেড়ে নেয়। এক কথায় তার স্বভাবে, ব্যবহারে তাকে আদর না করে কেউ পারবে না।

—তবে সে মোটেই ওয়াচ ডগ নয়।

—একা একা গিয়ে একদিন পরখ করেই আসুন। সত্যি সে ওয়াচ ডগ কিনা।

মিঃ সোম বললেন, উনি যখন খাবেন না, তখন আর ওঁকে ডিটেন কর না রমা, ড্রাইভারকে বল, ওঁনাকে ছেড়ে আসুক।

৯

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রবীন এসে উপস্থিতি হল। মিঃ সোম তার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞেস করে বললেন, কাল অত রাত্রে খাওয়ায় অসুখ করেনি তো?

রবীন হেসে উত্তর দিল, আমরা লেখক। লেখার নেশায় কতদিন রাত ভোর হয়ে যায়। ঘড়ি ঘন্টা মিলিয়ে খাওয়ার বিলাসিতা অন্ততঃ আমার নেই।

—কিন্তু এভাবে খেলে যে আপনার পরে এসিডিটি ফর্ম করবে। দ্যাট ইজ নট্ গুড।

—যেতে দিন আমার কথা। চলে যাচ্ছে—বাকী ক'টা বছরও চলে যাবে।

—এ বয়সে এসব নিয়ম মেনে যদি না চলেন, তবে আমার মত বৃদ্ধ হলে নানা রোগে ভুগতে হবে।

যাক আজ আর আপনার অত লেট করাব না। বেগম সুরাইয়া স্বামীর সঙ্গে ফিরে এলেন একটা মানসিক দুর্ভাবনা ও দুঃখ নিয়ে। কারণ হুমায়ুন সাহেবের সন্তানদের তিনি অপত্য স্নেহেই আদর যত্নে

বড় করেছিলেন। নিজের সন্তানদের অভাব তিনি দাদার সন্তানদের দিয়ে পূর্ণ করেছিলেন। তাই জারিনার দুঃখময় জীবন, সেতারার উশৃঙ্খলতা তাঁকে ব্যথা দিয়েছিল।

তিনি নবাব সাহেবকে বললেন—কেন এমন হল? আমি তো ওদের কাউকে কুশিক্ষা দিইনি। তবে কেন জারিনা সুখী হল না? সেতারা এত উশৃঙ্খল হল?

নবাব সাহেব উত্তর দিয়েছিলেন, জারিনার কোন দোষ নেই। ফয়েজ যদি অমানুষ উশৃঙ্খল হয় তবে জারিনা কি করতে পারবে? জারিনার রূপের মত রূপ দুর্লভ। জারিনার মত গুণী মেয়েও সচরাচর দেখা যায় না। তবু এমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রী পেয়েও যদি ফয়েজের মন না উঠে থাকে—এজন্য তুমি জারিনার দোষ দিতে পার না। পরন্তু আমি শুনেছি ঐ অমানুষটা ড্রিংক করে জারিনার উপর অত্যাচার করে। বেচারি চোখের জলে নীরবে সব সহ্য করে এবং কাউকে এ সব জানায় না। এমন কি তার মা বা ভাবীকেও নয়?

বেগম সুরাইয়া প্রশ্ন করেছিলেন, তবে তুমি জানলে কি করে?

ঐ বাচ্চা ছেলে দুটির থেকে সব খবর জেনেছি। ওরা বাবাকে ভীষণ ভয় পায়। মাকে তেমনি ভালবাসে। সেতারা যা করছে তার জন্য আমি আশ্চর্য হচ্ছি না। ওর মামা বাড়ির রক্তেই বোধ হয় কোন দোষ আছে। তাই ফারুক অমন দুর্জন হয়েছে। তাই সেতারাও অমন উশৃঙ্খল হয়েছে। তদুপরি তোমার ভাবী ছোট মেয়ে বলে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছেন। নতুবা অত বড় মেয়েকে সারা দিনরাত ভগ্নিপতিদের সঙ্গে অত হুল্লোড় করতে কেন এ্যালাউ করেন? ভগ্নিপতি হলেও তারা অপজিট সেক্স সেটা তো তিনি জানেন। এবং জামাইদের চরিত্রও তাঁর অজানা নয়।

—তারপর কি হল?

—অল্প কিছু দিনের মধ্যে বেগম সুরাইয়া খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবাব বহু চিকিৎসা করালেন। কিন্তু দুরারোগ্য ক্যানসারের হাত থেকে তাঁকে বাঁচানো গেল না।

—হুমায়ুন সাহেবের ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখতে এসেছিল কি ?

—জারিনা খুব অসুস্থ থাকায় সে আসতে পারেনি। ইউসুফ তার স্ত্রী শিরীণও সেতারা এসেছিল।

ইউসুফ ও শিরীণ রোজ তবু নার্সিং হোমে আন্টিকে দেখতে যেত। কিন্তু সেতারা যেন এই সুযোগে এখানে মজা লুটতে এসেছিল। সকাল থেকে রাত অবধি কোথায় কার সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেউ জানত না। বেগম সাহেবকে নিয়ে যখন যমে মানুষে টানাটানি তখন সে সুখের পায়রার মত উড়ে বেড়াচ্ছে।

—নবাব সাহেব বা ইউসুফ এ সম্বন্ধে কিছু বলেননি সেতারাকে ?

—নবাব সাহেব কিছু বলেননি। কারণ তিনি এতদিন এদের টলারেট করেছেন স্ত্রীর জন্য। তবে ইউসুফ বলেছে, আন্টিকে দেখতে এসে তুই একদিনও তাঁর কছে গেলি না। উনি রোজ তোর কথা জিজ্ঞেস করেন। উনি তো যাওয়ার পথে। অন্ততঃ একদিন জ্ঞান থাকতে থাকতে দেখে আসতে তো পারিস।

সে উত্তরে কি বলল জানেন ? ওঃ, আই কান্ট স্টেণ্ড দিজ্ সর্ট অফ পেসেণ্ট।

ইউসুফ আর কিছু বলেনি। বলা বৃথা। সে আউট অফ কণ্ট্রোল। তা'ছাড়া সে তার বাবার মত নরম স্বভাবের ব্যক্তিত্বহীন ছেলে। তাই কাউকে কড়া কিছু বলতে পারত না।

—তারপর কি হল ?

—বেগম সুরাইয়া একদিন নার্সিং হোমেই মারা গেলেন। বাড়িতে চাকর ঝি হতে সবার চোখে জল। একমাত্র শুষ্ক নয়ন দেখেছিলাম সেতারার। ইউসুফ আমেরিকান ফার্মে বড় পোস্টে চাকরি পেয়েছিল। তাই ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে আন্টি মারা যাবার কয়েক দিনের মধ্যে সপরিবারে চলে গেল। রয়ে গেল সেতারা।

—নবাব সাহেব আপত্তি তোলেননি ?

—তিনি খুবই আপত্তি করে বলেছিলেন, তোরা সেতারাকে নিয়ে যা। সে এখানে থাকলে আমার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করা ছাড়া কিছুই

হবে না। ইউসুফ বলেছিল —না, সে এখানে অন্ততঃ আন্টির ৪০ দিনের কাজ হওয়া পর্যন্ত থেকে আপনার দেখাশোনা করবে। আপনি একেবারেই একা পড়ে গেছেন। আমার ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা তাই আপনার বৌমা থাকতে পারল না এখন। তবে আমরা আবার কাজের সময় আসব।

—সেতারা কি নবার সাহেবের দেখাশোনা করত?

—সেতারা করবে নবাব সাহেবের দেখা শোনা! তার তো স্ফূর্তি। সারা দিনরাত বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হৈ-চৈ করছে। রাতে সেকেণ্ড সো-তে সিনেমা যাচ্ছে! সিনেমা হল হতে ফোন করছে রাত ১১টার সময় ড্রাইভারকে কার নিয়ে অমুক সিনেমার কাছে পাঠাও।

—নবাব সাহেব কি কার পাঠিয়েছিলেন?

—নবাব সাহেব পত্নী বিয়োগের শোকে কাতর। তদুপরি সেতারার এ ধরনের আচরণে উনি খুবই বিরক্ত। নবাব সাহেব ঘুম থেকে উঠে চান করে নামাজ পড়ে ব্রেকফাস্টের টেবিলে যাবার আগেই সেতারা কোন রকমে মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ত। আর ফিরত যখন নবাব সাহেব ঘুমিয়ে পড়েন। সুতরাং ফোনের এই ম্যাসেজ রিসিভ করেছিল নবাব সাহেবের পুরানো টাইপিস্ট। বেগম মারা যাবার পর তিনি প্র্যাক্‌টিক্যালি নবাবের সহচর বা সাথী রূপে তাঁর বাড়িতে থাকতেন। এবং তাঁর খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির তদারকী করতেন। যে ঘরে ফোন থাকত—সেই ঘরে রাত্রে তিনি শুতেন। যা'তে ফোনে নবাব সাহেবের ঘুমের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। সুতরাং তিনি ফোন ধরে বললেন—তুমি তো জান এ সময় ড্রাইভারকে পাওয়া যায় না। এত রাত্রে কে তোমার জন্য কার নিয়ে যাবে? যাদের সঙ্গে সিনেমায় গেছ, তাদের বলো তোমাকে ড্রপ করে যেতে।

—উনি টাইপিস্ট হয়ে সেতারার সঙ্গে এভাবে কথা বললেন?

—কারণ বৃদ্ধ রাজেনবাবু নবাব জাহাঙ্গীরের আমলের বিশ্বস্ত লোক। এই সব মেয়েদের জন্মাতে উনি দেখেছেন। কোলে পিঠে নিয়েছেন।

—নবাব সাহেব কখনও কিছু বলতেন না সেতারাকে ?

—আপনি ব্যাচেলার মানুষ। তাই নবাব সাহেবের মত পত্নীগত প্রাণ স্বামীর পত্নী বিয়োগের ব্যথা উপলব্ধি করতে পারছেন না। কোন সন্তান না থাকায় উভয়ের মধ্যে প্রেম এত গভীর ছিল যে একে কখনও অন্যের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারতেন না। সেই অবস্থায় বৃদ্ধ নবাব পড়ে রইলেন, তাঁর আবাল্যের সুখ দুঃখের সাথী চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। তিনি চোখের জলে একাকী দিন কাটাচ্ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবরা এসে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি যেন দুঃখে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। তাই সেতারার কীর্ত্তি কিছুই জানতেন না। একদিন আমাকেই সব নবাব সাহেবকে জানাতে হল। নতুবা বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে গেলে আমাকেই উনি দোষারোপ করবেন। রাজেনবাবু নবাব সাহেবের মানসিক এই অবস্থায় কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

—নবাব সাহেব কি বললেন ?

উনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মিঃ সোম, সেতারা আমার সঙ্গে কত বছর ছিল আপনার মনে আছে ?

বললাম, ১২ বছর ছিল।

—সাকুল্যে ওর জন্য আমার কত হাজার টাকা খরচ হয়েছে ?

—হাজার বিশ ত্রিশ তো হবেই। কারণ বেগম সাহেবা তো শুধু সেতারাকে লেখাপড়াই শেখাননি। ওদের পোশাক পরিচ্ছদ এমন কি গয়নাও তৈরি করে দিয়েছেন অনেক। সুতরাং কমপক্ষে বিশ ত্রিশ তো হবেই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উনি বললেন, আমার এই গোটা টাকাটাই জলে গেছে। মেয়েটা সুশিক্ষা তো পেলেই না, বরং ওর মা ও ভগ্নিপতিদের প্রশ্রয় একেবারে বয়ে গেছে। দুঃখ হয় আপনাদের বেগম সাহেবার জন্য। ওঁনার কত আশা ছিল ভাইঝিদের লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল বংশে সুপাত্রে বিয়ে দিবেন। তাঁর কোন আশাই পূর্ণ হল না। বরং সেতারা এত জাহান্নমে গেছে যে হয়ত এজন্য

তাঁর আত্মা দুঃখ পাচ্ছে। আপনি ওর দাদাকে সব লিখে দিন আমার নাম করে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন সে সেতারাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে।

—ইউসুফ কি সেতারাকে নেবার ব্যবস্থা করেছিল?

—মোটেই নয়। তাদের উদ্দেশ্য অন্য রকম ছিল। অর্থাৎ শাঁসালো আঙ্কেল যেন হাত ছাড়া না হন। তাঁর ভাগ্নেরা যেন এই অবস্থায় এসে তাঁকে দখল না করে।

—তাঁর ভাগ্নেরা কি রকম? তাঁরা কি কেউ এসেছিল?

—তাঁর এক ভাগ্নেকে তিনি পুত্রের মত স্নেহ করতেন। তিনিও মামা মামীকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু নবাব সাহেবের দুর্ভাগ্য সেই ভাগ্নে অল্প বয়সেই মারা গেলেন। অন্য সব ভাগ্নেদের অবস্থাই স্বচ্ছল। মামার সঙ্গে তাঁদের স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল—কিন্তু তেমন মাখামাখি ছিল না। অপর এক ভাগ্নে মুক্তি যুদ্ধের সময় মুক্তি ফৌজের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আর এক ভাগ্নে ঢাকায় মামার প্রাসাদটি দখল করে বসে আছে, অবশ্য প্রাসাদের মূল্যবান ধন দৌলত নবাব সুরাবর্দি পূর্বেই কলকাতায় সরিয়ে এনেছিলেন—তবু কথায় বলে মরা হাতি লাখ টাকা। তাই নবাবী আমালের সবই তো পড়ে ছিল—এমন কি তাঁর পুরো জমিদারি। সেই ভাগ্নে সেই জমিদারির খাজনা তুলতেন। অবশ্য এ সবই হয়েছে বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের পর।

—কেন? মুক্তি যুদ্ধের পর কেন?

—কারণ এঁরা সবাই পাকিস্তান আমলে নবাবী চালে ছিলেন। সকলের অবস্থা স্বচ্ছল। সকলেই পদস্থ পদে আসীন ছিলেন। তাই এঁরা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ছিলেন। এজন্যই মুক্তি ফৌজরা এদের আক্রমণ করেছে; যথেষ্ট ক্ষতি করেছে এঁদের সম্পদের। এই জন্য ওঁনার সেই ভাগ্নে পালিয়ে মামার ফাঁকা প্রাসাদে সপরিবারে এসে উঠেছিলেন।

—সেতারা কি তবে থেকে গেল?

—সেই মোর্নিং পিরিয়ডে উনি কিছু বললেন না সেতারাকে। কিন্তু ৪০ দিনের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর তিনি ইউসুফের সাথে সেতারাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। এবং ইউসুফকে বলে দিলেন যেন সে আর কখনও সেতারাকে কলকাতায় না পাঠায়।

—ইউসুফ কি নবাব সাহেবের সেই কথা রেখেছিল?

—মোটেই নয়। বহুবার সেতারা এসেছে। কখনও ইউসুফের সঙ্গে, কখনও একা, কখনও মেজ ভগ্নিপতি ও জারিনার সঙ্গে। ভগ্নিপতি ও সেতারা এখানে এসে স্ফূর্তি করত। দুজনে ড্রিংক করে রাত করে বাড়ি ফিরত। বেচারী জারিনা একা ঘরে শিশুপুত্র দুটিকে নিয়ে চোখের জল ফেলত। আন্টি থাকলে হয়ত সে এত লোন্‌লী ফিল্‌ করত না। কিন্তু এত বড় প্রাসাদে একা একা তার খুবই খারাপ লাগত। বিগত দিনের স্মৃতি যেন তাকে গ্রাস করতে চাইত। নবাব সাহেব মেয়েটির দুঃখ উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি তাঁর কাজ তাড়াতাড়ি সেরে বাসায় ফিরতেন হতভাগী জারিনাকে ও তার বাচ্চাদের সঙ্গ দিতে। নানা গল্প গুজবে ভরিয়ে দিতেন সময়টা। জারিনা সেতারার মত নয়। যে কয়টা দিন সে কলকাতায় থাকত যতটা সম্ভব আঙ্কেলের দেখাশোনা যত্ন আত্তি করত। জারিনা ছিল স্নেহময়ী কন্যা, জননী, প্রেমময়ী ভার্যা। কিন্তু তার প্রথম দুটি সার্থক হলেও শেষটি তার অপূর্ণ থেকে গেল। তার দিক থেকে কোন ত্রুটি না থাকলেও ফয়েজ তার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থই শুধু করেনি—দুঃখের ডালিতে পূর্ণ করেছিল।

নবাব সেতারা ও ফয়েজের এসব বেহাল্লাপনা পছন্দ করতেন না। তিনি কড়া ভাষায় ফয়েজকে বলে দিলেন, এবার থেকে আমার বাসায় উঠতে হলে কেবল স্বামী, স্ত্রী আসবে। শ্যালিকাকে সঙ্গে আনবে না। জারিনা ও ছেলেদের বাসায় ফেলে রেখে একা একা রোজ সেতারাকে নিয়ে বেড়াতে তোমার লজ্জা করে না। চট্টগ্রামে তুমি যা ইচ্ছে তা করতে পার। আমার বাসায় আই উড্‌ নট এ্যালউ ইউ অল দিজ।

—ফয়েজ কি উত্তর দিল?

—নবাব সুরাবর্দির মুখের উপর উত্তর দেবার সাহস তার ছিল না। অগত্যা পরদিন হতে জারিনাকে সঙ্গে নিয়ে যেত। কিন্তু সেটা তার পক্ষে আরও কষ্টদায়ক। চোখর সামনে স্বামী ছোট বোনের সঙ্গে প্রেম করছে, তা কোন সতী সাধ্বী স্ত্রী সহ্য করতে পারে না। তাই এর পরদিন হতে শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে সে আর যেত না। বাচ্চাদেরও পড়ার অজুহাতে যেতে দিত না। শিশুদের সামনে পিতার এই স্বৈরাচার জারিনা পছন্দ করত না। এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে তাদের সামনে। তা ছাড়া ছোট বেলার এ সব স্মৃতি বড় হলেও মনের উপর চাপ দেয়। তাই জারিনা চায়নি তাদের পিতার বেলাল্লাপনা দেখে তাঁকে পুত্ররা অশ্রদ্ধা করুক বা এ সব কীর্ত্তি অন্যদের কাছে গল্প করুক।

—কত দিন এঁরা ছিলেন এভাবে?

—নবাব সাহেব বেশী দিন এ সব কাজে প্রশ্রয় দেননি। ওঁনার ওখানে অন্য গেস্ট আসবে। তাই গেস্ট রুম খালি করতে হবে—এই অজুহাতে তিনি ফয়েজকে বিদায় করলেন। অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদেরও যেতে হল। তবে সেতারা ও ফয়েজের অলক্ষ্যে তিনি জারিনাকে বলেছিলেন, মাই চাইল্ড, ডোণ্ট গেট এনয়েড উইথ মি। এখানে সেতারাকে সবাই তোদের আন্টির ভাইঝি বলে জানে। তার সঙ্গে ফয়েজকে এভাবে চলাফেরা করতে দেখলে নানা কথা উড়ে বেড়াবে। এতে আমার মাথা কাটা যাবে। তার চেয়ে চট্টগ্রামে ওরা যা ইচ্ছে করুক—তার জন্য আমাকে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রবীন বলল, আজ উঠি। নতুবা কালকের মত দেরি হয়ে যাবে। কাল রামুকাকা বেচারী অত রাত অবধি সারারাত ঘর বাইর করেছে আমার জন্য। দিন কাল ভাল নয়। তার দুশ্চিন্তা, যদি কোন অঘটন ঘটে।

—মিঃ সোম বললেন, না, আজ আমিও আর আপনাকে আটকাব না।

এমন সময় রমা এসে বলল, দাদু, আজ তুমি ওঁনাকে ছেড়ে দাও। নতুবা ওঁনার বড্ড দেরি হবে। উনি তো আবার ওঁনার গার্জেনের পারমিশন ছাড়া কোথাও খাবেন না।

—আপনি যাই বলুন। আমার ঐ দুই প্রতীক্ষীয়মান গার্জেনদের আমি দুঃখ দিতে চাই না।

রমা হেসে বলল, আই এ্যাম জেলাস্ অফ দেম। রিয়েলী দে আর লাকি। আমার যদি এমন কোন গার্জেন থাকত!

মিঃ সোম হেসে বললেন, তুই আর মিঃ সেনকে লেগ্ পুল করে ডিলে করে দিস না।

রমা হেসে উত্তর দিল, বেশ মিঃ সেন আপনার গার্জেনদের অনুমতি নিয়ে আসবেন, আগামী কাল কিন্তু আপনাকে ডিনার খেয়ে যেতে হবে।

১০

পরদিন মিঃ সেনকে ঢুকতে দেখেই রমা বেয়ারার হাতে চা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, গার্জেনদের পারমিশন পেয়েছেন তো?

—তা পেয়েছি। তবে 'জয়' মুখ কাল করে রইল। কারণ আমার সঙ্গে বসে খাবার আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত হল।

—বাবা! কুকুরেরও এত অভিমান!

—আপনি জানেন না কুকুর কেবল কথা বলতেই পারে না। নতুবা ওদের ফিলিং বা এ্যাকশন্ সবই মানুষের মত। মান, অভিমান, রাগ, আনন্দ, আতঙ্ক সমস্ত ফিলিংই তারা এক্স্প্রেস করতে পারে। তবে মানুষের মত তারা আনগ্রেটফুল নয়। বরং ভীষণ ফেইথ্ফুল।

মিঃ সোম ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আপনারা কিসের গল্প করছেন?

রবীন উত্তর দিল-না, এমন কিছু সিরিয়াস নয়, বলছিলাম কুকুর খুব বিশ্বস্ত পশু। মানুষের মত আনগ্রেটফুল ক্রিচার নয়।

—ঠিক বলেছেন মিঃ সেন। কেবল কুকুর নয়। ঘোড়াও খুব ফেইতফুল ক্রিচার। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি বুদ্ধিমান মানুষ! মানুষ তার স্রষ্টাকে অবমাননা করছে—নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। কারণ তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ক্রূরতা, কুটিলতা, হীনতা, নীচতা, ঈর্ষা, হিংসা, কৃতঘ্নতা। এই সব দুষ্ট প্রবৃত্তির জন্যই কি স্রষ্টা মানুষকে বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি রূপে গড়েছিলেন? পশু-পক্ষিদের থেকেও শিক্ষনীয় আমাদের অনেক কিছু আছে।

—যাক, আমার কাহিনীটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি। এভাবে রোজ-রোজ আপনাকে টেনে এনে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

রবীন বাধা দিয়ে বলল, 'নট এট্ অল। বরং এই গল্প শুনে আমি আনন্দ পাচ্ছি। আমার লেখবার কিছু সামগ্রীও পাচ্ছি। অবশ্য রোজ আপনাকে বিরক্ত করছি। আর আপনাদের এখানে রোজ নানারকম চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে যাচ্ছি।

—ও কিছু নয়। আপনার মত একজন লেখকের সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয়। নবাব সুবাবদি তাঁর নিজের সম্পত্তি দেখাশোনা করবার জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন। ঢাকা থেকে তিনি চট্টগ্রাম বেড়াতে গিয়েছিলেন। সালেহা বেগম ক্যানসারে ভুগছেন এবং জারিনার ফুলের মত সুন্দর ছেলেটার হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। এ সব খবর পেয়েই নবাব সাহেব গিয়েছিলেন। দেহ থাকলেই রোগ ব্যাধি হয়ে থাকে—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু জারিনার নিষ্পাপ, ছোট্ট ছেলেটির মৃত্যু সংবাদে নবাব দুঃখ পেয়েছিলেন এবং আশ্চর্যও হয়েছিলেন। অসুখ কিছুই ছিল না। স্কুল হতে ফিরে সে খাবার খেয়ে খেলতে গেল। খেলার মাঠে কেউ একজন তাকে কিছু খেতে দেয়। এবং টুকটুক ওখানেই ঢলে পড়ে। কে তাকে কি খেতে দিয়েছিল শিশুর দল তা সঠিক বলতে পারেনি। তবে তারা বলল, একজন 'মহিলাকে দেখে টুকটুক 'আন্টি আন্টি বলে ছুটে যায়। সেই মহিলা তার ব্যাগ হতে কি একটা তার হাতে দিয়েই

চলে যায়। শিশুটি ঐ খাবারটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাটে ঢলে পড়ে।

জারিনা কেঁদে নবাবকে বলেছিল, আঙ্কেল, আমার ছেলেরা তো বাইরের লোকের থেকে কিছু নেয় না বা কিছু দিলেও খায় না। তা ছাড়া ওর সঙ্গীদের থেকে সেই আন্টির চেহারার যে বর্ণনা পেয়েছি, তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে সে কে? শিশু হলেও তারা অনেক কিছু বুঝতে পারে। হয়ত সেই অপরাধেই তাকে হত্যা করা হল। কিন্তু কেন? কেউ তো কারও কোন ব্যাপারে প্রতি বন্ধক হয়নি?

নবাব জারিনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—হয়ত তুই মা যে সন্দেহ করছিস তা মোটেই ঠিক নয়। হয়ত অন্য কোন কারণে তার মৃত্যু ঘটেছে।

সে কথা কি করে বিশ্বাস করব? পোস্টমর্টমে ওর পাকস্থলীতে যে বিষ পাওয়া গেছে!

ব্যাপারটা নবাব সাহেবের ভাল লাগেনি। তিনি সালেহা বেগমকে বললেন, আপনি ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলেন না। সে লেখাপড়াও করছে না। সারা জীবন তাকে দেখাশোনা করবে কে? বৌমার সঙ্গেও তো তার বনিবনা হয় না শুনছি।

সালেহা বেগমের দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন আমারই পাপে আমার সংসার ছারখার হয়ে গেল। আমি যদি আপনাদের অমতে তনিমার সঙ্গে ফারুকের বিয়ে না দিতাম, তবে এত বড় নবাব বংশের এই পরিণতি হত না, সেতারা এখন সম্পূর্ণ আমার কণ্ট্রোলের বাইরে। তা ছাড়া ওর কীর্ত্তি এখানে বা ঢাকায় সবাই জানে। সুতরাং কোন খানদানী বংশে ওর বিয়ে হবে না। তার অদৃষ্ট সে নিজেই সৃষ্টি করেছে। সেতারাই আমার শেষ জীবনে চরম দুঃখের কারণ। ফারুকের জন্য ও সেতারার জন্য আমার পরিবারের সুখ শান্তি নষ্ট হল।

—ঐ শিশুটির মৃত্যু সম্বন্ধে কি কোন পুলিস তদন্ত হয়নি?

—কি হয়েছিল জানি না। কারণ আমরা কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম নবাবের সঙ্গে।

কয়েক মাস পর শালেহা বেগম মারা যান। নবাব সাহেব আরও কয়েক মাস পর তাঁর সম্পত্তির ব্যাপারে ঢাকায় যান। সেখান থেকে ইউসুফের সঙ্গে দেখা করতে তিনি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন।

—সেতারা তখন কোথায়, ও কি করত ?

—শালেহা বেগমের মৃত্যুর পর হতে সেতারা ইউসুফের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ভাবির সঙ্গে তার কখনই বনিবনা হত না। তা ছাড়া ওর যা স্বভাব চরিত্র হয়েছিল—তা কোন ভদ্র পরিবারে থাকবার উপযুক্ত নয়। সুতরাং ইউসুফের স্ত্রীকে তেমন দোষ দেওয়া যায় না।

যাক, একদিন ভোরবেলা ইউসুফ ফোন পেল জারিনা মারা গেছে। খবরটা ইউসুফ নবাব সাহেবকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতেই নবাব সাহেব প্রথমেই বললেন—ইট ইজ নট এ ন্যাচারেল ডেথ। কাল বিকেলে জারিনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তার তো কোন অসুখ ছিল না। ছোট ছেলেটি তার সমস্ত মন প্রাণ জুড়েছিল। সে আমায় কাল বলেছিল, আঙ্কেল, টুকুকে যেমন করেই পারি আমি মানুষ করব। এর জন্যে দরকার হলে ওকে নিয়ে আমি আলাদা কোথাও বাস করব ও নিজে চাকরি করব।

বিলম্ব না করেই আমরা সবাই ছুটলাম। দূর থেকে নবাব সাহেব দেখলেন—তাঁদের দেখে সেতারা জারিনার ঘর থেকে যেন পালিয়ে গেল। তার মুখের ভাব ও চাল-চলন খুব অস্বাভাবিক। পলকের মধ্যে সে যেন মিলিয়ে গেল।

ফয়েজও ঐ মৃত্যুর যথাযথ কারণ দিতে পারল না। অথচ এত বেলা পর্যন্ত কোন ডাক্তার ডাকেনি ; পরিস্থিতি বিচার করে নবাব সাহেব বললেন ইউসুফকে, ব্যাপারটা সোজা নয়। এটা পুলিস কেস্ হবে। টাকা পয়সা দিয়ে যদি চাপা দিতে পারিস—তার চেষ্টা কর। নবাব ফের্দৌসীর বংশের মুখে চুনকালি মাখাস না। যাক, আমি আর

এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না। আমি এখন ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি। কারণ কালই আমার কলকাতায় ফিরবার টিকিট বুক করা হয়েছে। যেভাবে পাবিস কেসটা হাস্-আপ করে নিস। বেচারি জারিনা! তোদের আন্টির সবচেয়ে প্রিয় ছিল। কত ভাল ভাল ঘর হতে জারিনার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। তোর মা-ই মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিলেন। নবাব-বাগিচার আরও একটি সুন্দর ফুল ঝরে পড়ল।

—জারিনার কেস্ কি হাস্-আপ্ হয়েছিল?

—হ্যাঁ, বহু টাকা খরচ করে ডাক্তারকে হার্ট অ্যাটাক্ লেখানো হয়েছিল ডেথ সার্টিফিকেটে। শুনেছি ফয়েজকে বেশ মোটা টাকা দিয়ে পুলিসের মুখ বন্ধ করতে হয়েছে।

—নবাব ফের্দৌসীর বংশেও কি হত্যার পর হত্যা চলেছিল? হোয়াট্ এ স্ট্রেইনজ! কিন্তু কেন এ হত্যা? ইচ্ছে করলে কি সে ফয়েজকে বিয়ে করতে পারত না? ওদের তো একাধিক বিয়েটা ধর্মতই গ্রাহ্য।

—আমরাও ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন এমন গর্হিত কাজ হল? নিষ্পাপ দুটো প্রাণকে এভাবে সরিয়ে দেওয়া হল। তবে একজনের উপর হত্যার সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিল। হত্যার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল তা দুর্বোধ্য থেকে গেছে। কারণ এ ভয়ঙ্কর ব্যাপারের পর ফয়েজ সেতারাকে এক সঙ্গে কেউ আর দেখেনি। ইতিপূর্বে দু'জনে যেরূপ বেলাল্লাপনা করত তা একেবারে বন্ধ হয়েছিল। লোক পরম্পরা শুনেছি যে জারিনার মৃত্যুর পর ফয়েজ কোন প্রকারেই সেতারাকে আর আমল দেয়নি। এমন কি ফিরোজার বাড়িতে যাতে সে ঢুকতে না পারে—এইজন্য কড়া পাহারা রেখেছে তার বাড়িতে। ফয়েজের নাকি বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে জারিনার মৃত্যুর পর। এত বৎসর যে শিশু পিতৃ-স্নেহ-আদর হ'তে বঞ্চিত ছিল—মাতৃ বিয়োগের পর ফয়েজের সমস্ত মন প্রাণ অবশিষ্ট সেই শিশু টুকুর জন্য উজাড় করে দিয়েছিল।

—আফ্টার অল ফিরোজও রক্ত মাংসের মানুষ। তাই অমন সুন্দর গুণবতী স্ত্রীর অবর্তমানে তার মূল্য বুঝেছে।

—না, মিস্টার সেন, ফিরোজদের মত রাস্কেলদের জন্য দোষ ক্ষালনের কোন অজুহাত সহ্য করা যায় না। টাকার জোরে কেস হাস্‌-আপ্‌ করলেও লোকের জানতে কিছু বাকি নেই—দোষী কে?

রমা খাবার ব্যবস্থা করল। রবীনকে খাবার টেবিলে ডাকা হলে থরে থরে সাজানো খাবার দেখে সে বলল, এ-সব খাবার তো আমার সইবে না। কারণ আমি গ্যাস্ট্রীকের রোগী—ঘি, তেল, মশলা সব আমার শত্রু।

মিঃ সোম বললেন, একদিন ব্যতিক্রম হলে দোষ হবে না। আপনি খাবেন বলে দিদিভাই নিজে এসব খাবার তৈরি করেছে।

—কেন আপনি এত কষ্ট করতে গেলেন?

—কষ্ট যখন করেই ফেলেছি গল্প করতে করতে একটু টেস্ট করে যান। ভয় নেই, হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেব। সব হজম হয়ে যাবে।

—আপনার ওসব গুণও আছে নাকি? ডাক্তারিও জানেন বুঝি!

—ওটা আমার দিদিভাই-এর 'হবি' বলতে পারেন। কিন্তু রমার ডায়োগনেশিস খুব কারেক্ট। প্রতিবেশী অনেকেই রমার ওষুধে সুস্থ হয়েছে।

রবীন প্রশ্ন করল, আপনার কাহিনী শেষ হতে আর ক'দিন লাগবে মিঃ সোম?

—খুব বোরিং লাগছে, তাই না?

—ঠিক তার উল্টো। বরং খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। তবে কি—আমি তো চাকুরে মানুষ। এবার আমার কাজের শিফ্‌ট চেঞ্জ হবে। একটা পত্রিকার সহ-সম্পাদক আমি। এতদিন দিনের শিফ্‌ট ছিল। এবার আমার নাইট শিফ্‌ট শুরু হবে। তাই যদি অল্প কিছু দিনের মধ্যে হয়ে যায়—তবে না হয় কারো সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিতাম।

—না, খুব বেশী দিন আর লাগবে না। নবাব সুরাবর্দির কাহিনী দিয়ে শেষ করব। কাল সেই পর্বই শেষ করব।

নানা গল্প গুজবের মধ্যে নৈশ-ভোজ শেষ করে রবীন বাড়ি ফিরে গেল।

১১

পরদিন রবীনকে আসতে দেখেই রমা হেসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, নমস্কার, আপনার আসতে দেরি দেখে ভেবেছিলাম বুঝি জোর করে কাল আপনাকে খাইয়ে আপনার স্টমাক্ আপ্‌সেট করিয়ে দিয়েছি।

—না, তা নয়, অফিস থেকে ফেরার পরই এক বন্ধু এসেছিল। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেছে।

মিঃ সোম ঘরে ঢুকে বললেন, কেমন আছেন? আপনার দেরি দেখে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

—আমার উপন্যাসের শেষ পর্ব না শুনে কি আমি ছুটি নিতে পারি? খুব বেশী অপারগ না হলে জানবেন আমি নিশ্চয়ই আসব।

বেয়ারা এসে হুইস্কির বোতল ও চা খাবার রেখে গেল। রমা চা তৈরি করে রবীনের সামনে রেখে বলল, আপনারা এবার গল্প করুন, আমি একটু ঘুরে আসি। দাদুকে উদ্দেশ্য করে বলল, দাদু, বেশী যেন স্ট্রেইন না পড়ে। তোমার প্রেসারটা আজ বিলক্ষণ বেড়ে গেছে।

—না রে, গল্প করলে কি আর স্ট্রেইন পড়ে? তুই নিশ্চিন্তে একটু ঘুরে আয়। সারা দিন তো বুড়োর সেবাতে ঘরে বন্ধ থাকিস। আসুন মিঃ সেন, শেষ পর্ব শুরু করা যাক—নবাব সুরাবর্দির স্ত্রী বেগম সুরাইয়া মারা যাবার পর নবাবের সংসারের খুবই দুরবস্থা হল। বেগমের আমলের অনেক পুরানো চাকর, বাবুর্চি হয়ত বেগমের সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে নতুবা বেশী টাকার লোভে বাংলা দেশে চলে গেছে।

কারণ বাংলা দেশে এখন অনেক পারিশ্রমিক মজুরদের। কেউ কেউ বা কলকাতাতেই অন্য কোন বড় হোটেলে চাকরি নিয়েছে। নবাব সাহেবও বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তার জন্য মিনিয়েলসদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন! অশীতিপর বৃদ্ধ ওপারে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এপারের সব কাজ একটু একটু করে গুছিয়ে নিচ্ছেন। নবাব সাহেব নবাবী আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন, চলেছেনও আর দশ জন নবাবের মত। কিন্তু তাঁর অদ্ভুত যে অভ্যাস প্রায়ই নবাবদের মধ্যে পাওয়াযায় না, তা হল তাঁর অর্ডারলিনেশ ও ডিসিপ্লিন। বেগমের অভাবেও তাঁর প্রাসাদের শৃঙ্খলা একটুও ব্যাহত হয়নি।

—এপারের সব কাজ বলতে কি বুঝাতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পূর্ব বাংলায় তাঁর যে বিরাট সম্পত্তি পড়েছিল, পাকিস্তান সরকার হিন্দুদের সম্পত্তির মত তাঁর সম্পত্তিও শত্রু সম্পত্তি বলে একোয়ার করেছিল। তার সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ দেবার প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দিয়েছিল। তা ছাড়া তাঁর কলকাতায় যে বিরাট প্রাসাদ, নানা কোম্পানির কাগজ ছিল—তাঁর অবর্তমানে সেগুলির বিলি ব্যবস্থা করতে তাঁকে নিত্য ছুটোছুটি করতে হচ্ছে উকিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি, নানা মন্ত্রীদের দপ্তরে। এজন্য তিনি সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। কথা আছে মরা হাতির দামও লাখ টাকা। দেশ বিভাগ হওয়ায় তাঁর সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। যে সামান্যতম ক্ষতি পূরণের দাবি তিনি ভারত সরকারের কাছে করেছিলেন, তাও কিছু কম নয়। কিন্তু তিনি অপুত্রক, তাই তাঁর এত ব্যস্ততা। এজন্য তাঁকে সারা দিনই প্রায় বাইরে বাইরে ঘুরতে হত। বুদ্ধিমান নবাব সাহেব জানেন--অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। বিশেষ করে ভৃত্যশ্রেণীকে সব সময় কাজে ডুবিয়ে না রাখলে তাদের মাথায় শয়তানীর বোঝা চাপে।

—তাই বুঝি উনি তাঁর ভৃত্য সংখ্যা কমিয়েছিলেন ?

—কথাটা মিথ্যে নয়, এই জন্যই তিনি লিমিটেড ফিউ দিয়ে কাজ

চালাবার ব্যবস্থা করলেন। কেবল নবাব বংশেই তাঁর জন্ম নয়। যথেষ্ট বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনি। কিন্তু তাঁর অবস্থা চরমে উঠল— কারণ বেগমের আমলের বিশ্বাসী বাবুর্চিটিও মারা গেল। তারপর হতে তাঁর খাবারের কি দুর্ভোগ। কখনও ক্যালকাটা ক্লাব হতে খাবার আসে, কখনও বা অন্য কোন বড় হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খান। এতে তাঁর খরচও পড়ে বেশী। তা ছাড়া সেই একই ধরনের একঘেঁয়ে খাবার খেয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন মাঝে মাঝে।

—এমন কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া তখন কেউ এদেশে কি ছিলেন না, যিনি তাঁর সঙ্গে এসে থাকতে পারতেন ?

—না. এটাও তাঁর দুর্ভাগ্য বলতে হবে। তাঁর একটি ভাগ্নে তাঁর খুবই অনুগত ছিল। সেই ভাগ্নেও অল্প বয়সে মারা গেছে। তাঁর স্ত্রীও একমাত্র পুত্র নিয়ে পাকিস্তানে বাপের বাড়ি চলে গেছে স্বামীর মৃত্যুর পরই। হয়ত তখন যদি নবাব সাহেব তাঁদের নিজের কাছে এনে রাখতেন—তবে শেষ বয়সে তাঁর যে অবস্থা হয়েছিল, তার কিছু সুরাহা হত।

—তিনি তা করলেন না কেন ?

—তখন বেগমের টান ছিল নিজের ভাইপো ভাইঝিদের উপর। তাদের উপর তাঁর ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা। তাঁর আশা ছিল বৃদ্ধ বয়সে অর্থ নয়, শুধু পাশে থেকে দেখাশোনা করবে তাঁর ভাইপো ভাইঝিরা। তাদের জন্য হাজার হাজার টাকা যে ব্যয় করা হচ্ছে, তার এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ কি তাদের থাকবে না? মানুষ ভাবে এক—হয় অন্যরূপ। তাই তাঁর জীবিতাবস্থায় তিনি তাঁর ভুল বুঝে গেছেন।

—ইউসুফ আর আসত না ?

—তারা অবশ্য আসত স্ফূর্তি করতে। এতে তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক হত। কারণ তখন ক্যালকাটা ক্লাব থেকে খাবার আসছে। এঁদের জন্যও তাই আসত। এতে নবাব সাহেবের কষ্ট হত। তাঁর

জীবন কেটেছে ডিসিপ্লিনের মধ্যে। আসলে সেই চিরাচরিত নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ত। তাদের খাওয়া না হলে উনি খেতে বসতেন না। এরা স্ফূর্তি করে রাত সাড়ে-এগারোটা-বারোটায় বাড়ি ফিরত। ইউসুফের ছেলে—সে-ও এখন যুবক। সে-ও চাকরি করে। কিন্তু ওদের জীবনে ডিসিপ্লিন বলে কিছু নেই। কারণ এরা সব এ যুগের নওজোয়ান। ওরা বলে, আঙ্কেল, আপনি খেয়ে নেবেন। আমরা পরে এসে খাব।

নবাব সাহেব উত্তর দিতেন, ওয়েল মাই বয়, আমরা সে যুগের লোক। গেস্ট না খেলে হোস্ট খেতে পারে না। তা ছাড়া তোদের আন্টি নেই। হোটেলের খাবার, তোরা সব ইয়ং ছেলে। তোরা না খেলে আমি বুড়ো আগে খাই কি করে?

আমরা ভাবতাম নবাব সাহেব সারাদিন মুখ বুজে পড়ে থাকেন—নাতিরা এসেছে, এখন বোধ হয় তাঁর ভালই কাটছে।

উনি বলতেন, নাঃ মিঃ সোম, এই বয়সে ইনডিসিপ্লিনড্ লাইফ আই কাণ্ট স্ট্যাণ্ড। তার চেয়ে আমার নিঃসঙ্গ জীবনই ভাল। সকাল থেকে এত চিৎকার, হৈ হুল্লোড় পছন্দ করি না। আমি যে একজন বৃদ্ধ রয়েছি, আমাকে রেসপেক্ট না করুক, আমার এইজটাকে অন্ততঃ রেসপেক্ট করা যে উচিত, তা এ যুগের ছেলেরা বোধ হয় জানে না। ইউসুফ কেন তার ছেলেদের এ সব ট্রেনিং দেয়নি জানি না।

—এটা তো ইউসুফের স্ত্রীর উচিত ছিল শিক্ষা দেওয়া।

—সবাই সব কিছু জানে না। এ সব খানদানি পরিবার না হলে জানে না।

—যাক, তারপর কি হল?

—এভাবেই তারা মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে বেশ কিছুদিন মজা লুটে ফিরে যেত। একবার তাঁর চোখ অপারেশন হবে। একটা কথা বোধ হয় বলা হয়নি। বেগম মারা যাবার পর নবাব সাহেব তাঁর থাকবার জায়গার কাট-ছাট করলেন। নীচের তলা একটি ভিন দেশী পদস্থ রিটায়ার্ড অফিসারকে ভাড়া দিলেন। এক নিঝ'ঞ্ঝাট

পরিবার—স্বামী স্ত্রী। নবাব সাহেবের এত বড় বাড়িতে একটি সঙ্গীর ব্যবস্থা করলেন। নবাব সাহেবের আশা সিদ্ধ হয়েছিল, কারণ এ দম্পতি সদা সর্বদা নবাব সাহেবের খোঁজ খবর নিতেন।

—যাক, ভগবান কাউকে একেবারে মারেন না। তবু এমনি একজন ভাল ভাড়াটে পেয়েছিলেন।

—তারপরের ঘটনা শুনুন। নবাব সাহেব ইউসুফকে লিখলেন, আমার চোখ অপারেশন হবে, সম্ভব হলে তুমি যদি তখন কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে আসতে পার, তবে ভাল হয়। কিন্তু সঙ্গে আর কাউকে এন না। উত্তরে ইউসুফ লিখল, আপনার বৌমা ও নাতিরা আপনাকে দেখবার জন্য খুব ব্যস্ত। উত্তরে নবাব সাহেব দীর্ঘ টেলিগ্রাম করে জানালেন, আমাকে দেখবার সুযোগ ওরা অনেক পাবে; এখন সবাইকে এনে আমাকে বিব্রত কর না। বিশেষ করে সেতারা যেন না আসে। আমি নার্সিং হোমে থাকব—সুতরাং তুমি ছাড়া অন্য কেউ আসবে না।

—উনি কি নবাব সাহেবের অনুরোধ রেখেছেন ?

—মানুষ চরিত্র চিনতে আপনার এখনও দেরি আছে। মানুষ যখন স্বার্থের রথ চালিয়ে যায়, তখন সে ভুলে যায় সব কিছু। অনেক দৃষ্টিকটু কাজও করতে তখন তার বিবেকে লাগে না। ওরা ভেবেছিল, আঙ্কেল নার্সিং হোমে যাবেন। এই অপারেশনে তিনি শেষ পর্যন্ত স্ট্যাণ্ড করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তাই ইউসুফ কেবল সপরিবারেই আসল না, বার বার নিষেধ সত্ত্বেও সেতারাকে সঙ্গে আনল। সঙ্গে এনেছে এবার নবাব সাহেবের ঢাকার বাড়ির পুরানো বাবুর্চিকে প্লেনে রিটার্ন টিকিট কেটে।

—অর্থাৎ নবাবকে সর্বতোভাবে এম্ব্যারসড্ করা হল যেন।

—শুনুনই মজার কথা। নবাব তাঁদের দেখে প্রসন্ন হলেন না। বুঝলেন এদের অভিপ্রায়। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। নিষেধ সত্ত্বেও এরা যখন সপরিবারে আসবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করল, তখনই তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তিনি তাঁর নীচের

ভাড়াটের (যারা সলভেন্ট পার্টি। অনেক ইম্‌পোর্ট এক্সপোর্ট বিজনেস" করে মাসে তাঁর আয় পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা।) কাছে হাজার ত্রিশ টাকা তুলে দিয়ে গেলেন এবং বললেন আমার সই নিয়ে আমার টাইপিস্ট বা ড্রাইভার বা সারভেন্ট আসবে—তাকে তখন সেই এমাউন্টের টাকা দেবেন। এবং একটা একাউন্ট রাখবেন। তা ছাড়া ইলেকৃট্রিক বিল, টেলিফোন বিল, কর্পোরেশন ট্যাক্স ইত্যাদি তিনি নিজেই চেকে সই করে তাঁদের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন—বিল-গুলি এলে তাঁর টাইপিস্টকে দিয়ে সব যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করলেন।

—ইউসুফ সাহেবরা আসার পর নিশ্চয় ব্যবস্থা পালটে গেল?

—না, উনি খুব শক্ত মনের লোক। উনি বললেন, তোমাদের বারণ করলাম, তবু তোমরা এলে। বেশ, তোমরা থাক, খাওয়া দাওয়া কর। বাবুর্চি যখন এনেছ তখন আর হোটেলের খাবার আনাবার দরকার নেই। বাড়িতেই রান্নার ব্যবস্থা কর। তোমাদের যা প্রয়োজন রাজেনবাবুকে লিস্ট দিও- উনিই এনে দেবেন। টাকা নীচের ভাড়াটে দেবেন।

—এই ব্যবস্থায় নিশ্চয় তারা ক্ষুণ্ন হলেন?

—তা তো হবেই। কারণ তারা তো এসেছিল এবার আন্টির সম্পত্তি বা দামী জুয়েল অর্নামেন্ট সব হাত করবার জন্য। বেগমের প্রচুর দামী গয়না ছিল। তা ছাড়া নবাব জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর সব গহনাই প্রায় বেগম সুরাইয়া পেয়েছিলেন।

বুদ্ধিমান নবাব বললেন, আমি আগেই নীচের ভাড়াটের সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। উনি এখন আমার অবর্তমানে সব একাউন্ট রাখবেন! তোমরা এসেছ দুদিন এখানে বেড়িয়ে যাও—এ সব ঝামেলার মধ্যে কেন যাবে? তা ছাড়া এখন পূর্ব ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করলে ওঁনারা অফেন্‌ডেড় হবেন। আফ্‌টার অল, আই এম এলোন এণ্ড এ লোনলি পারসেন। ওঁরাই আমার রোগে শোকে দেখাশোনা করেন। আই কান্ট অফেন্‌ড দেম।

আর কেউ না চিনলেও ইউসুফ চিনত তার নবাব আঙ্কেল—মিনিস্টার আঙ্কেলকে, জানত তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। একবার তিনি যা না বলতেন তা একমাত্র আন্টি ছাড়া আর কেউই তাকে হ্যাঁ করাতে পারতেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে আন্টিকেও পরাজয় স্বীকার করতে হত।

—চাবি বোধ হয় ওঁদের দিয়ে গিয়েছিলেন?

—আপনি পাগল হয়েছেন! উনি চাবির বাক্স শুদ্ধ নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। কাউকে তিনি বিশ্বাস করতেন না! ওদের জন্য বড় গেস্ট রুম ও তার পাশের এটাচড্ বাথরুমটা খুলে রেখে গেলেন। ডাইনিং রুম ও ড্রইং রুমটাও খুলে রেখে গেলেন। তা ছাড়া নবাব ও বেগমের অন্যান্য ঘরগুলি তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে গেলেন। আর ব্যবস্থা করে গেলেন টাইপিস্ট রাজেনবাবু রাত্রে ড্রইং রুমে শোবেন। তিনি নবাব সাহেব যতদিন নার্সিং হোমে থাকবেন, ততদিন নবাব সাহেবের বাড়িতেই থাকবেন।

—এই ব্যবস্থাতে নিশ্চয়ই ওঁনারা খুশী হননি।

—খুশী কি বলছেন? তাঁরা খুবই বিরক্ত। কারণ রাজেনবাবু চব্বিশ ঘণ্টা পাহার দেওয়ায় কোন প্রকারেই ঐ সব ঘর খোলা সম্ভব নয়।

—তাঁরা কি নবাব সাহেবের দেখাশোনা করত?

—তাঁরা রোজ নার্সিং হোমে দেখা করতেও যেত না। সেতারা একদিনও যায়নি। ইউসুফ ও তার স্ত্রী তবু কয়েকদিন গিয়েছিল। রাতদিন তারা কার নিয়ে কলকাতা চষে বেড়াত। সাত দিনে দুই হাজার টাকা পেট্রোলের বিল এসেছিল। অবশ্য তখন পেট্রোল আজকের মত অগ্নিমূল্য ছিল না।

ওরা ভেবেছিল শোকার্ত ভগ্নস্বাস্থ্য অতি বৃদ্ধ নবাব এ যাত্রায় ফিরে আসবেন না। বা তাঁর দৃশক্তিও আর ফিরে আসবে না। কিন্তু ভগবানের অপার দয়ায় নবাবের উইল পাওয়ারে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন।

—এবার কি ব্যবস্থা হল ?

—ব্যবস্থা সব নিজের হাতে। রাজেনবাবুকে তিনি বাড়ি যেতে দিলেন না। তিনি সর্বক্ষণ তাঁকে যেন গার্ড করে চলেছেন। নবাব সাহেব সর্বক্ষণ কি এক চক্রান্তের আভাস পাচ্ছিলেন। তাই নবাব সাহেবের খাবার রাজেনবাবুর সামনে রান্না করিয়ে আনা হত।

—কিন্তু এতটা সতর্কতার কি কোন প্রয়োজন ছিল ? আফ্‌টার অল, তিনি ওল্ড ম্যান—এঁরা সবাই তাঁর কাছে ঋণী।

—ওয়েল মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড। মানব চরিত্র বড় জটিল। উনি যেদিন বাড়িতে এলেন, সেদিন তাঁকে যে পুডিং খেতে দেওয়া হয়েছিল তা নাকি চার পাঁচ দিনের বাসি। যে লোক জীবনে কোন দিন বাসি খাবার খাননি—তাঁকে জীবনের সায়াহ্নে অসুস্থ দেহে কিনা দেওয়া হয়েছে এতদিনের বাসি পুডিং। তা খেয়ে ওঁনার স্টমাক্ আপ্‌-সেট্ হয়। খোঁজ নিয়ে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়। ইউসুফ বুঝল এ বড় শক্ত ঘাঁটি। তাই সে নবাব সাহেব বাড়িতে ফিরে আসার দিন দুই পরেই ফিরে গেল, সেতারা ও বাবুর্চিকে রেখে।

—নবাব আপত্তি করেননি ?

—তিনি বেহিমেন্টলি আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী বলল, আপনি একেবারে একা। লোকেই বা আমাদের কি বলবে ? সেতারা আপনার দেখা শোনা করবে। তা ছাড়া সেতারার ভিসাও তো বেশী দিনের নেই।

নবাব বলেছিলেন, দুজন নার্স রেখেছি—যত দিন না আমার চোখ খোলা হয়। তা ছাড়া আমার পৈত্রিক আমলের বৃদ্ধ রাজেনবাবু আছেন। মিঃ সোম আছেন। নীচে ভাড়াটিয়া দম্পতি আছেন। তা ছাড়া আছেন আমার অগণিত বন্ধু বান্ধব। তোমরা সেতারাকে নিয়ে যাও।

—নবাব সাহেব বোধ হয় সেতারাকে ভয় পাচ্ছিলেন ?

—কোয়াইট ন্যাচারেল, আত্মীয় পরিজন মহলে যার এত বদনাম তাকে কাছে রাখা অনুচিত।

এদিকে ইউসুফ যাবার আগে আর একটি কুকর্ম করে গিয়েছিল। সেতারাকে দিয়ে নবাব সাহেবের অন্যতম এড্‌ভোকেটকে ধরে তাঁকে স্পর্ণসার করিয়ে তার ভিসা দু মাসের জন্য একস্‌টেণ্ড করিয়ে নিয়েছিল। তাঁকে বলেছিল, আঙ্কেলের হেল্‌থ খুব পুল ডাউন করেছে। আমি এসে নিজে রান্না করে ওঁনার ওয়েট বাড়িয়েছি। যদিও নার্স আছে—তবু নার্স কে কি বিশ্বাস করা যায়—আমিই সব দেখাশোনা করছি। সুতরাং আপনি যদি আমার স্পর্ণসার হন—তবে আঙ্কেলের বড় উপকার হয়। ভদ্রলোক সেতারার ইতিহাস জানতেন না। তিনি জানতেন সেতারা নবাব সাহেবের কাছ থেকে মানুষ হয়েছে। সেতারা খুবই ক্রুড্‌ মেয়ে। ভদ্রলোককে কনভিনসড্‌ করবার জন্য অনেক কথা বলে তাঁর মন গলিয়েছিল। সে বলেছিল, আঙ্কেল আমার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছেন—এখন এই অবস্থায় তাঁকে ফেলে কি করে যাই? আন্টির আত্মাও দুঃখ পাবে। আমার বিবেক দংশন করবে। আরও অনেক।

—সেতারা দেখছি ভয়ঙ্কর মেয়ে!

—ঠিক বলেছেন। আমার রমা দিদিভাই কখনও এত হিপোক্রেশির পার্ট প্লে করতে পারত না। আমি বলব—ইট ইজ এ ট্যালেণ্ট।

—ভদ্রলোক নিশ্চয়ই স্পর্ণসাড হলেন?

—স্বাভাবিক। নবাব সাহেবের মত ভাল লোকের উপকার সবাই করবে। এ সব ব্যাপার কিন্তু ইউসুফ বা সেতারা অলথ্‌, গোপন করে গেছে নবাব সাহেবের কাছে।

—উনি তবে কি করে জানতে পারলেন?

—বাড়িতে ফিরবার কয়েক দিন পর নবাব সাহেব যখন তাঁর এড্‌ভোকেট বন্ধুকে ফোন করে জানালেন—তখন তাঁর থেকে জানতে পারলেন এ সব ব্যাপার। ফোনে নবাব সাহেব এ সম্বন্ধে কিছু বললেন না।

পরদিন রাজেনবাবু সেই ভদ্রলোকের বড়িতে এসে জানতে চাইলেন সেতারা কতদিনের এক্সটেন্‌শন নিয়েছে। রাজেনবাবুর

থেকে মিঃ মিত্র জানতে পারলেন সেতারা যা বলেছে তার কোন কথাই সত্য নয়। বরং সেতারা থাকায় নবাব সাহেবের উদ্বিগ্নতা অনেক বেড়েছে। এ সব খবর শুনে মিঃ মিত্র একটু ঘাবড়ে গেলেন। তিনি এত গভীরে তলিয়ে না দেখে সেতারাকে বিশ্বাস করেই তার অনুরোধ রেখেছিলেন। তবে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন সেতারাকে, নবাব সাহেব তো আমাকে জানালেন না রাজেনবাবু বা মিঃ সোম মারফৎ। তিনি তো সব সময় রাজেনবাবু বা মিঃ সোমের মারফৎ তাঁর খবরাখবর পাঠান।

সেতারা চোখ বড় বড় করে উত্তর দিয়েছিল, হাউ কেন হি সেণ্ড ম্যাসেজ টু ইউ। নাউ হি ইজ ইন দ্যা নার্সিং হোম। মোরওভার রাজেনবাবু ইজ উইথ্ হিম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স।

শুধু তাই নয় যদি মিঃ মিত্র ফোন করে আমার থেকে ভেরিফাই করে নেন, তাই সে বলেছিল, আজই আমার লাস্ট ডেট্। আজ দরখাস্ত না করলে—কালই আমাকে ইণ্ডিয়া লিভ করতে হবে এ্যাজ আই এম এ ফরেনার।

—তারপর কি হল ?

—রাজেনবাবুর থেকে অল্প-সল্প কিছু শুনে মিঃ মিত্র মনে করলেন, তিনি খুব একটা ব্লান্ডার করে ফেলেছেন। তাই তিনি ফোন করে নবাব সাহেবের কাছে এপোলজি চাইলেন। এবং স্পর্ণসারশিপ উইথড্র করবেন কিনা জানতে চাইলেন। নবাব সাহেব বললেন, না, আপনি এখনই উইথড্র করবেন না। আমি দেখি তাকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠানো যায় কিনা।

—নবাব সাহেব কি সেতারাকে ফেরৎ পাঠাতে পারলেন ?

—না না। শুনুনই কি থ্রিলিং স্টোরী। বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন দুপুর এগারোটার সময় সেতারা মিঃ মিত্রের বাড়ির কড়া নাড়ল।

—তখন কি উনি বাড়ি ছিলেন ?

—না, না উনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। মিঃ মিত্রের বোনের কাছে সেতারা এমন ভাবে চোখের জলে ভাসিয়ে নানা কথা বলল যে, ভদ্রমহিলা তা শুনে খুবই শক্‌ড্ এবং ভয়ও পেলেন।

—কি এমন কথা তিনি বললেন যে মহিলা এতটা মুভড্ হলেন ?

—সেতারার অভিযোগ রাজেনবাবুর বিরুদ্ধে। সে জানাল, রাজেনবাবু সব সময় আঙ্কেলের সামনে বলছে, আপনার ভিশন্ আর ফিরে পাবেন না। একথা বলে তিনি রোগীর মর‍্যাল স্টেংথ নষ্ট করে দিচ্ছেন। রাজেনবাবু দু হাতে টাকা লুঠ করছেন। হাজার হাজার টাকা উনি উইথড্র করেছেন। আঙ্কেলের ব্যাঙ্ক হয়ত বাই দিস্ টাইম একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। উনি আমাকে স্ট্যাণ্ড করতে পারছেন না। উনি এক ডাক্তার এনেছেন, সেই ডাক্তারের সঙ্গে চক্রান্ত করে রাজেনবাবু আঙ্কেলকে মার্ডার করবেন, উনি ডাক্তার, চাকর, ড্রাইভার এমন কি আমরা যে বাবুর্চিকে এনেছি তাকেও হাত করেছেন। সবাই আমাকে ডিফাই করে চলছে। যেন উনিই বাড়ির অল ইন্ অল্। এমন অডাসিটি, ডাক্তার আমাকে সেদিন বলছেন, নবাব সাহেব এখন অল রাইট। নাও ইউ ক্যান্ গো ব্যাগ টু ইওর হোম। আমিও মুখের উপর বলেছি—দ্যাটস্ নট্ ইওর লুকআউট্। ইট ইজ মাই আঙ্কেল্স্ হাউস। আই নো ওয়েদার আই সুড্ গো অর নট্। তখন তিনি আবার বললেন, আপনি একজন ইয়ং গার্ল, কেন এই বৃদ্ধর জন্য বসে সময় নষ্ট করবেন? আমরা আছি। আমরাই ওনার দেখা-শোনা করতে পারব। তা ছাড়া নার্স আছে ফর টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স। কি দরকার আপনার এখানে থেকে সময় নষ্ট করা ? তবেই বুঝুন, রাজেনবাবু কত বড় জাল ছড়িয়েছেন।

—সত্যিই তো, এ তো ভারি অন্যায় ডাক্তারের এভাবে বলা।

—আরে কাহিনী শেষ হবার আগেই আপনি এত ইমপেশেন্ট হলে চলবে কেন ? ধৈর্য ধরুন।

ভদ্রমহিলা বললেন, তোমাদের বাড়িতে তো বেশ কয়টা অপমৃত্যু হয়েছে।

সেতারা বলল, হ্যাঁ, সেই জন্যই তো আমার ভয়। আমার বাবা ও এক আঙ্কেলকে মার্ডার করা হয়েছে। এনাকেও করাব চক্রান্ত করা হচ্ছে। রাজেনবাবু এমন ভাবে আঙ্কেলকে আমার এগেইনস্টে বলে

পয়জন করেছেন যে উনি কিছুতেই আমাকে স্ট্যাণ্ড করতে পারছেন না। ওঁনাকে ঠিক মেডিসিন না দিয়ে স্পুরিয়াস্ ড্রাগস্ দেওয়া হচ্ছে।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে জানলে স্পুরিয়াস্ ড্রাগস্ ?

উত্তরে সেতারা বলল, আন্টি থাকতেই আঙ্কেল ঐ ওষুধটা খেতেন হজমের জন্য। কিন্তু এখন ঐ ওষুধটা খেলেই আঙ্কেলের দাস্ত হচ্ছে। আমি একদিন টেস্ট করবার জন্য ওষুধটা খেয়ে দেখলাম—আমারও সেই অবস্থা। তারপর আমি ওষুধের ফাইলটা নিয়ে ড্রাগিস্টের কাছে যাই। তারা দেখে বলল—এটা স্পুরিয়াস ড্রাগস্। আমি তখন ওরিজিন্যাল ওষুধ কিনে ওটা ফেলে দিলাম।

—কিন্তু সেতারা, আমি বুঝতে পারছি না নবাব সাহেবকে মার্ডার করে রাজেনবাবুর কি লাভ? বরং উনি এত বছরের পুরানো বৃদ্ধ কর্মচারী। আমি জানি নবাব ও বেগম তাঁর পরিবারকে কত সাহায্য করেছেন। এমন কি দোতালা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। ছেলে-মেয়েদের পড়ার খরচ চালিয়েছেন, আরও কত ভাবে সাহায্য করেছেন। বরং তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলে আরও পাবার সম্ভাবনা।

—আপনি কেন বুঝতে পারছেন না উনি যে আঙ্কেলকে দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করিয়ে হাজার হাজার টাকা উইথড্র করেছেন। আঙ্কেল চেক্ আপ্ করলেই যে ধরা পড়বে।

—এত সোজা কেন মনে করছ? নবাব সাহেবের মত লোককে মার্ডার করলে কি উনি সহজে নিষ্কৃতি পাবেন?

—কে এসব ঝামেলা করবে বলুন? ওঁনার ওয়ারিশ তো কেউ ইণ্ডিয়াতে নেই। আমরাও থাকি না। আমাদের হয়ত খবর দেবে আফটার ক্রিমেশন।

—তোমরা তো ওঁনার ওয়ারিশ হতে পার না। অবশ্য উনি যদি উইল করে কিছু তোমাদের দিয়ে যান। তা নয়ত ওঁনার বোন ও ভাগ্নেই তো আইনত ওয়ারিশ।

—তা জানি। আমরা চাই-ও না। আন্টি আমাদের অনেক দিয়েছেন। তবে আমরা এসে দেখব ওঁনার ভেলুয়েবল সব কিছু

হাওয়া হয়েছে। আমি উনি স্ট্রং না হওয়া পর্যন্ত থাকতে চাই, কিন্তু, তা বোধ হয় সম্ভব নয়। যে আঙ্কেল আমাকে এত স্নেহ করতেন নিজের মেয়ের মত, তিনি আমাকে এত ডিসবিলিভ করছেন যে ওঁনার বেড্ রুমে আমাকে শুতে এলাউ করছেন না। ঐ বৃদ্ধ রাজেনবাবুকে শুতে এলাউ করছেন। আমি জানি আঙ্কেল আপনার দাদার কথা শোনেন। আপনি তাঁকে আমার হয়ে রিকোয়েস্ট করবেন যেন তিনি আমাকে এখন না পাঠান।

জারিনার কথা জিজ্ঞেস করতেই সেতারা মুখ হাত দিয়ে ঢেকে বলল, প্লিস্, তাঁর কথা জিজ্ঞেস করবেন না। ওর স্বামী এক নম্বরের রাস্কেল—তার জন্যই তো এমন অকালমৃত্যু হল, প্লিজ ডোণ্ট অ্যাস্ক্ মী এ্যানি মোর। লেট মি ফরগেট দ্যাট ইনসিডেণ্ট। আমি আপাকে এত ভালবাসতাম যে, ওঁনার কথা মনে হলেই আমি নিজেকে চেক্ করতে পারি না। এই সব চিন্তা করতে করতে এই কয়দিনে আমার পাঁচ কিলো ওয়েট কমে গেছে।

—এত সব কথা আপনি জানলেন কি করে ?

—মিঃ মিত্রর থেকেই শুনেছি। সেতারার অভিনয়ে সরল বিশ্বাসে মিঃ মিত্র রিকোয়েস্ট করেন নবাবকে তিনি যেন নবাব সাহেবের সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত সেতারাকে তাঁর বাসায় থাকতে দেন।

নবাব সাহেব উত্তরে বললেন, সী ইজ এ ডেনজারাস গার্ল। আপনি এমন অনুরোধ করবেন না।

তার পরদিন বেলা ১১টার সময় নবাব সাহেব মিঃ মিত্রর বোনকে ফোন করে সব শুনলেন এবং জানালেন সেতারা যা কিছু তাঁকে বলেছে তা সর্বৈব মিথ্যে। টাকা পয়সার কি ব্যবস্থা করেছিলেন তাও নবাব সাহেব তাঁকে জানালেন।

নবাব সাহেব ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—সেতারার বাবা, কাকাকে তো ওদেরি ভগ্নিপতি খুন করেছে। আমার কোন আত্মীয় করেনি। রাজেনবাবু থাকায় হয়ত আমি অপমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছি। সে কোনও দিন আমার জন্য রান্না করেনি। বরং সব সময় চাকরদের

অহেতুক গালি গালাজ করে। যার জন্য তারা চাকরি ছেড়ে চলে যেতে চায়। এই বাজারে বিশ্বাসী চাকর পাওয়া কত মুস্কিল আপনি জানেন। তার মধ্যে সে যদি সব সময় ওদের গালি গালাজ করে তবে তারা থাকবে কেন? আমার ঢাকার বাড়ির বাবুর্চিকে ওরাই এনেছে। তাকে সেতারা বলেছে—তোমাকে আমরা এনেছি। তুমিও ওদের দলে মিশেছ। সে উত্তরে বলেছে—আমি নবাব সাহেবের পুরোনো বাবুর্চি। আমি কোন দলে নেই। আপনারা আমাকে রাঁধবার জন্য এনেছেন—আমি রাঁধছি।

নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার সুবিধার জন্যই তারা বাবুর্চিকে এনেছিল আমার জন্য আনেনি। তবে তার জন্য প্লেনের রিটার্ন টিকিট কেটে আনত না। সেতারাকে ডাক্তার যা বলেছিলেন তা আমারই নির্দেশে বলেছেন। সেতারার ঘোরতর আপত্তি নার্সকে রাখায়। সে বলে আমি নার্সিং করব। কি দরকার নার্সের? নার্সিং-এর সে কি জানে? আমার বহু বছরের পুরানো এই ডাক্তার নার্স—সবার প্রতি যেন তার বিদ্বেষ ভাব।

সারাদিন সে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত দুপুরে বাড়িতে ঢোকে। আগে এক দল বখাটে ছেলে আসত তার সঙ্গে, আমার বাসায় হৈ হুল্লোড় করত। আমি বলেছি আমার বাসায় এ সব বেলাল্লাপনা আমি বরদাস্ত করব না। আমার বাসায় এ সব ছেলেদের আনতে পারবে না, তা ছাড়া আমি অসুস্থ। এ সব গোলমাল স্ট্যাণ্ড করব না। সে বলেছিল, ঐসব ছেলেরা তার বন্ধুদের ভাইরা। কিন্তু সেতারা যখন কলেজে পড়ত তখন তার বন্ধু ছিল সম্ভ্রান্ত ঘরের দুটি মেয়ে শীলা ও সোমা। কিন্তু সেতারা আজ প্রায় দু' আড়াই মাস এখানে আছে। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বের হয়ে রাত্রে বাসায় ঢোকে এরা আমাদের বাসার কাছেই থাকে। কিন্তু সে এক দিনের জন্যও তাদের সঙ্গে দেখা করেনি। রাতদিন সেতারার কাছে ফোন আসছে। কেউ ফোন করলেই সে তার ঐ দুই বন্ধুর নাম করে। কিন্তু এরা দুজন ফোন করে আমাকে জানিয়েছে—শুনছি সেতারা কলকাতায়

এসেছে। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে দেখা করে না, ফোনেও তাকে কখনও পাই না। যখনই ফোন করি, শুনি সে বাড়ি নেই। আঙ্কেল, শুনেছি সে ম্যারিয়ামের সঙ্গে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওকে ম্যারিয়ামের সঙ্গে মিশতে দেবেন না। সি ইজ এবসলিউটলি এ থার্ড ক্লাস গার্ল। সে নিজে তো জাহান্নামে গেছে—একদল শিক্ষিত ইয়াং ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সে বিজনেস করছে। এইভাবে তার আর্নিং হচ্ছে। এ সব ভদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরাও একেবারে লুস্ ক্যারেকটারের হচ্ছে।

আমিও বুঝতে পারছি সেতারা বখে যাচ্ছে। নতুবা রোজ ট্যাক্সি করে রাতদিন এত ঘোরা ফেরা করার টাকা সে কোথায় পাচ্ছে? তার ভাই দেয় না। আমার থেকে একদিন মাত্র একশো টাকা নিয়েছিল। তা কবে উড়ে গেছে। কারণ সারাদিন তো বাইরে হোটেল রেস্টুরেণ্টেই তাকে খেতে হচ্ছে। শুনেছি বাসায় যখন সে ফেরে তখন তার মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যায়। তার চালচলন চরিত্র এত খারাপ হয়েছে যে আমি তাকে স্ট্যাণ্ড করতে পারছি না।

নবাব সাহেব আরও বলেন, আমি তাকে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছি। সে মুখের উপর বলে আমি যাব না। এমন সেইমলেস্ মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। আমাকে যদি কেউ এই ভাবে বলত, আমি এট্ ওয়ান্স ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতাম। যেতে বললে রোজই বলে তার পাসপোর্ট পায়নি, আগামি কাল পাবে।

মিঃ মিত্রের বোন বলেন, আমাকে সেতারা বলেছিল, আঙ্কেল যদি আমার পাসপোর্ট-এর কথা জিজ্ঞেস করেন—আপনারা বলবেন পাসপোর্ট এখনও দেয়নি।

উনি উত্তরে বলেছিলেন, অযথা মিথ্যে কেন বলতে যাব? তুমি বা তা গোপন করছ কেন? আঙ্কেলকে বুঝিয়ে বল। আর উনি যদি তোমার এখানে থাকা পছন্দ না করেন—তুমি চলে যাও। এই সময় ওঁনার মনের উপর চাপ পড়ে এমন কোন কাজ করা উচিত নয়। নবাব সাহেবের অনুরোধে মিঃ মিত্রর বোন সেতারাকে ফোন করে বলেছিলেন, তোমার কথামত নবাব সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে।

কিন্তু রাজেনবাবু তো টাকা উঠাতে পারেন না। কারণ নীচের ভাড়াটিয়া এ সব হ্যান্ডেল করছেন। তা ছাড়া তোমার অনেক খবরই তো ঠিক নয় উনি জানালেন। উনি চান তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। ওঁনার জন্যই তোমার থাকা—উনি যদি তা না চান—তোমার যাওয়া উচিত। সে বলল, হ্যাঁ আমি ২৫ তারিখে যাব। অর্থাৎ আরও পনের দিন পর। আমি ঐ বাবুর্চির সঙ্গে এক প্লেনে যাব না। এরা কি চক্রান্ত করেছে জানি না। শেষে পথে সে আমাকে খুন করবে।

—তোমাকে খুন করে কার কি লাভ ?

মিঃ মিত্রের বোন সেতারা যখন তাঁর কাছে এসেছিল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার মা, আন্টি মারা গেছেন। তোমার বেনেদেরও বিয়ে হয়ে গেছে। তুমি চাকরি করছ না যখন, তখন বিয়ে করছ না কেন ? উত্তরে সেতারা বলেছিল তাঁকে—কাকে বিয়ে করব ? আপনি জানেন না, আজকালকার একটি ছেলেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার দুই ভগ্নিপতিকে দেখলাম। এ সব ছেলেদের আমি ঘৃণা করি। তাই আমি বিয়ে করছি না।

—উঃ! কি সাংঘাতিক মেয়ে সেতারা।

সত্যি তাই। ওদের আশা ছিল নবাবের অবর্তমানে তাঁর মূল্যবান জিনিসপত্র সরাবে। নবাব সাহেব আরও বিরক্ত হয়েছিলেন তাঁকে তাঁর এ্যাসেট সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়। এই সব কারণে তাদের ওপর তিনি বিশ্বাস হারালেন। তিনি বল্লেন, আমার কর্মচারীরা আমার কি আর ক্ষতি করতে পারে? দু টাকা চার টাকা পাঁচ টাকা হয়ত বাজার থেকে এদিক ওদিক করতে পারে। কিন্তু ফারুকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে সেতারা ক্রিমিন্যাল হয়ে গেছে। সম্পত্তির জন্য বা আমার ভ্যালুয়েবেলস্-এর জন্য তারা আমাকে খুন করতে পারে। যেমন করেছে তাদের বাবা ও কাকাকে।

—সেতারা কি গিয়েছিল ?

—নবাব সাহেব তাকে যেতে বাধ্য করলেন এবং সে যাওয়ায় উনি শোয়াস্তি পান। রাজেনবাবুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারলেন।

—সেতারা ফিরে যাওয়ায় কি রি-অ্যাকশন হয়েছিল তাঁর পরিবারে?

—নবাব সাহেব বলেছিলেন, ইউসুফ তাঁকে লম্বা এক চিঠি লিখেছিল। নবাব নাকি তাঁর যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। একটি কথা, নবাব সাহেব কখনও এদের পরিবারের কারো থেকে কোন রকম সাহায্য পাননি। বরং এরাই নানা ভাবে তাঁকে এক্সপ্লয়ট করেছে। শেষ বয়সে উনি শান্তিতে শেষ ক'টা দিন কাটাতে চান। তাই ওদেব কাউকে কখনও আমন্ত্রণ জানাননি। ওরা এসেছে নিজেদের প্রয়োজনে। প্রয়োজন মিটে গেলে ফিরে গেছে। অনাত্মীয় পরিচিত মণ্ডলীই বরং প্রয়োজনে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। কারণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নবাব সুরাবর্দি কত লোকের যে উপকার কত ভাবে করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। যেমন অমায়িক উদারচেতা লোক ছিলেন, তেমনি আবার প্রয়োজনে কঠোর হতে দ্বিধা বোধ করতেন না। যেমনি ফুলের সুন্দর চেহারা, তেমনি টকটকে রং।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রবীন বলল, আজ অনেক রাত হয়ে গেল। আজ চলি।

—আজ আসুন, রাত বেশী হয়েছে। ড্রাইভার পৌঁছে দেবে। কাহিনীগুলি লিখতে ভুলবেন না কিন্তু।

—নিশ্চয়ই লিখব। সেই জন্যই তো এতদিন ধরে কাহিনীগুলি শুনলাম।

১২

দীর্ঘ পনের দিন পর রবীন সেন যখন আবার মিঃ সোমের বাড়ি আসল, বাড়ির চেহারা একেবারেই বদলে গেছে। বাড়ির সেই জৌলুস আর নেই। যদিও গেটে তখনও দারোয়ান পাহারায়—কিন্তু তার যেন কেমন নির্লিপ্ত ভাব। সে যেন কি এক গভীর

চিন্তায় মগ্ন। রবীনকে দেখে যদিও গতানুগতিক ভাবে সেলাম ঠুকল। ভেতরে যেতে বলল। কিন্তু অন্যান্য বারের মত সঙ্গে করে এসে পৌঁছে দিল না। রবীন বুঝতে পারল কোথায় একটা ছন্দ পতন হয়েছে।

পোর্টিকোতে একটা ট্রাক দাঁড়ান। একজন মাড়োয়ারী চেহারার লোক তাতে বাড়ির মূল্যবান আসবাবপত্র ওঠাচ্ছে। এ সব দেখে রবীন যেন কেমন থমকে দাঁড়াল। যে ভৃত্য রোজ মিঃ সোমের জন্য হুইস্কি নিয়ে আসত—সে এসে রবীনকে ভেতরে নিয়ে গেল। রমার পরিধানে আজ সাদা ভয়েলের থান শাড়ি ও সাদা ব্লাউস। মুখে যেন বিষাদের ছায়া। অমন মেঘবরণ চুলের গুচ্ছ কেটে কেটে ছোট বব করেছে। রবীনকে দেখে স্মিত হাস্যে রমা বলল—আপনি ও ঘরে বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।

যে কক্ষে প্রতিদিন রবীন বসত—সে ঘরে কোন আসবাবপত্রই নেই। ঘরটা যেন খাঁ খাঁ করছে। ঝালর দেওয়া লাইটের জৌলুস বা নানা দামী মূর্তি নেই। দু পাশে দুটো নিয়ন লাইট জ্বলছে। খান দুই তিন সাধারণ কাঠের চেয়ার, একপাশে একটি ছোট টিপয়। যে বয় খাবার বয়ে আনত আজ তার চোখা চাপকান পাগড়ি আঁটা পোশাক নেই। নিস্তব্ধতা যেন সমস্ত প্রাসাদটাকে গ্রাস করছে। রবীনকে অভ্যর্থনা জানাতে মিঃ সোম আজ এগিয়ে এলেন না। কাউকে ডেকে যে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করবে—আশেপাশে এমন কাউকে খুঁজেও পেল না।

বেশ খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সে বসে রইলো। মনের মধ্যে নানা স্মৃতি, নানা কথা যেন উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু পূর্বের একাদশ দিনের স্মৃতির সঙ্গে আজকের স্মৃতির কোথাও যেন কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছে না।

এমন সময় রমা দু হাত তুলে নমস্কার করে বলল, আপনাকে আজ অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম মাপ করবেন। যাবার আগে শেষ কাজগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করতে হচ্ছে—তাই এক'টা দিন একদম সময় পাইনি।

—ব্যাপার কি বলুন তো? মিঃ সোম কি অসুস্থ? তাঁকেও তো আজ দেখছি না। বাড়িটার মধ্যে যেন প্রাণহীন বৈধব্যের ছায়া। কি ব্যাপার, জিনিষপত্র সব ট্রাকে উঠছে। বাড়ি বদল করছেন নাকি? অন্য কোথাও বাড়ি কিনেছেন নাকি?

—দাদু আর কোন দিন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন না। তিনি আর এই লোকে নেই—বলতে বলতে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল রমার গাল বেয়ে। তাড়াতাড়ি সে নিজেকে সংযত করল।

—কি বলছেন আপনি? উনি কোথায় গেছেন? কবে গেছেন?

—আপনি যে দিন চলে গেলেন। আপনি যাবার পর উনি ডায়েরী লিখলেন অনেক রাত অবধি। আমি বার কয়েক ওঁনাকে বারণ করেছি রাত জেগে কাজ করলে ওঁনার প্রেসার বাড়তে পারে। কিন্তু উনি কেবল বলেছেন—এ কাজ আজ রাতেই শেষ করতে হবে। আরও একটা কথা বলেছেন—আমার মনে হচ্ছে মিঃ সেনকে আমার কাহিনীর শেষ পর্ব বোধ হয় শোনান হবে না। তাই লিখে রাখছি, উনি এলে তুই ডায়েরীটা তাঁর হাতে দিস। তাঁর এ ধরনের অসংলগ্ন কথার অর্থ তখন বুঝিনি।

আমি ঘুমোতে চলে গিয়েছিলাম। সেদিন আমাকে যে কি মহানিদ্রা আচ্ছন্ন করেছিল তা জানি না। খুব ভোরে আমিই রোজ দাদুকে বেড-টী দিই। আমি বেড-টী নিয়ে যখন তাঁর ঘরে ঢুকলাম—তিনি যেন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ডাকতে সাড়া দিলেন না। গায়ে হাত দিয়ে জাগাতে গিয়ে দেখলাম গা বরফের মত ঠাণ্ডা। আমি তাড়াতাড়ি ডায়েরীটা তুলে নিলাম। তার মধ্যে পেলাম একটা চিঠি। আমার উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা দিয়ে লেখা। বুঝলাম এটা আত্মহত্যা। দেখলাম ওঁনার ঘুমের ওষুধের শিশি একেবারে খালি। অর্থাৎ উনি বোধ হয় একমুঠো ওষুধ একত্রে খেয়ে মনের যন্ত্রণার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। আমি তখন তাড়াতাড়ি ডায়েরীটা আমার ঘরে সরিয়ে রেখে ডাক্তারকে ফোন করলাম। উনি এসে দেখে বললেন হার্ট ফেল। দাদুর হার্ট খুবই উইক ছিল। সুতরাং ডাক্তারি সার্টিফিকেটে

তাই লিখে দিলেন। উনিও দাতুর বন্ধু ছিলেন। আমাকে অনেক প্রবোধ দিয়ে উনি দাতুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করবার ব্যবস্থা করলেন।

রমা ঐ ঘরের এক পাশে একটা বই-এর আলমারি থেকে একটা লাল রং-এর মোটা ডায়েরী এনে হাতে তুলে দিল। সেই ডায়েরী খুলে কয়েক লাইন পড়ে রবীন বুঝল এ কোন এক অনুতপ্ত হৃদয়ের আকুতিতে পূর্ণ এই ডায়েরী।

রবীন ডায়েরীটা নিজের ফোলিও কেসের ভেতর রেখে বলল, আমায় একবার খবরটা দিলেন না! এত দীর্ঘ সময়ের আলাপের পর বন্ধুত্বের হাত বাড়াবার অধিকারটুকুও কি লাভ করিনি?

—আমায় মাপ করবেন মিঃ সেন—আমি যে কি যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সেই ক'টা দিন কাটিয়েছি—তা একমাত্র ভগবান জানেন। আপনার ঠিকানাটা আমার কাছে ছিল না। ড্রাইভারের কাছে জিজ্ঞেস করা সমীচিন নয়, তাই রোজই অধীর প্রতিক্ষায় বসে রয়েছি। আপনিও যে হঠাৎ এমন ভাবে ডুব মারলেন কেন জানি না, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আপনাকে এক্স্‌পেক্ট করেছিলাম।

—আমি ঠিক ডুব মারিনি। অফিসের কাজেই আমি এই ক'টা দিন কলকাতার বাইরে ছিলাম। আমি যাবার আগে ফোনে আপনাকে জানিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু কানেকশন পাইনি। কলকাতা শহরে ফোনের লাইন পাওয়া তো মুস্কিল। কিন্তু এত বড় ঘটনা যে ঘটতে পারে আমার কল্পনাতীত।

বেয়ারা এক কাপ চা ও কিছু খাবার নিয়ে এলে রবীন বলল, না, না আজ আর নয়। আমাকে মাপ করুন।

রমা হেসে বলল, আজই হয়ত আমার জীবনে আপনাকে এই শেষ চা অফার। কাল আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। এ মাসের শেষের দিকে আমি লণ্ডনে চলে যাব। তারপর আমার জীবনের সব কিছুই অনিশ্চিত—এক কথায় সম্পূর্ণ ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেব।

—বাড়ি ছেড়ে দিতে হেবে কেন?

—সলিসিটারের চিঠি হ'তে জানতে পেরেছি দাতুর বাড়ি মড্‌গেজ আছে। আমি এই অভিশপ্ত বাড়ি রাখতেও চাই না।

—মিঃ সোম সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—আপনাকে জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তা ছাড়া আপনাদের বলেছিলাম প্রথমার্ধে যে আপনারা দাদুর সাইকেয়েট্রিকের কাজ করছেন, কথাটা সত্যি। আমার দাদুরা তিন পুরুষ ধরে এই নবাব বাড়ির ম্যানেজার। সৎ অসৎ উপায়ে এঁদের ঐশ্বর্য হয়েছিল। দাদুরা চার ভাই ছিলেন। একমাত্র দাদু ছাড়া কেউ বেঁচে নেই। সবাই প্রাক্-বিবাহ যৌবনকালেই নানারকম অপমৃত্যুতে মারা গেছেন। আমার পিতারাও তিন ভাই এক বোন ছিলেন। আমার বাবা ছাড়া অন্য সবাই যৌবনে প্রাক্-বিবাহ-কালে মারা যান। আমার বাবাই একমাত্র বিয়ে করেছিলেন। আমার পিসীও বিয়ের অল্প কিছুদিন পর হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। আমার বাবা ছিলেন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। আমার বিবাহ-রাত্রে ডাকাতের হাতে মারা পড়লেন আমার মা, বাবা, আমার দুই দাদা ও হবু স্বামী।

—আপনি বিবাহিতা ?

দুঃখের হাসি টেনে রমা বলে, বিয়ের রাতে বর এসেছিলেন মুকুট পরে। কিন্তু মালা বদল বা গোত্রান্তর হবার আগেই সব শেষ। আমি তাঁর মৃত মুখ দেখেছি। আমার দিদা সন্তানদের শোকে আগেই মারা গিয়েছিলেন। তারপর হতেই দাদুকে পেয়ে বসেছিল মদ।

উনি বলতেন, পিতৃ-পিতামহের অনেক পাপার্জিত অর্থে তৈরী আমাদের সম্পদ—তারই পাপে আমরা সবাই নির্বংশ হলাম। তারপর তিনি আমাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন তোর ভবিষ্যৎ তুই নিজে গড়ে নিস। আমি আর সে ধৃষ্টতা করব না।

—বিয়েটা কি আপনার কলকাতায় হচ্ছিল ?

—না আমাদের দেশের বাড়িতে। এখানে থাকলে ডাকাত এতগুলি লোককে এত সহজে শেষ করে যেতে পারত না। উনি তারপর আরও একটা বড় শক্ পেয়েছেন নবাব সুরাবর্দির মৃত্যুতে। তিনি দাদুর পিতৃতুল্য ছিলেন। নবাব সাহেব শেষ জীবনে বড়ই কষ্ট পেয়েছেন। যে লোকের বাড়ি প্রতিদিন কত লোক চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে গেছেন—সেই লোক জীবনের অন্তিম সময়ে খাদ্যাভাবে কষ্ট পেয়েছেন। অর্থ আছে কিন্তু বিশ্বস্ত লোক নেই যে তাঁকে তৈরি করে দেবে। অনেক রকম ব্যাপার ঐ বাড়িতে চলছিল তার কিছু আভাস উনি নানা সূত্রে পেতেন। কিন্তু প্রতিবাদ করবার

সাহস হারিয়ে ছিলেন। হঠাৎ একদিন রাজেনবাবু ফোনে দাদুকে ডেকে জানালেন নবাব সাহেব মারা গেছেন। ঐ মৃত্যুকে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। অসহায় শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসে যে বৃদ্ধ গৌরবের চূড়া হতে এমন ভাবে একাকীত্বের গ্লানিতে ডুবেছিলেন দূর থেকে তাঁর অফিসিয়াল কাজ করা ছাড়া দাদুর আর করণীয় কিছু ছিল না।

—আচ্ছা, আপনারা কেন ওঁনার খাবার পাঠাতেন না?

—ওখানেই তো মুস্কিল। বার কয়েক খাবার পাঠিয়েছিলাম। উনিও খেয়ে খুব খুশী হতেন। কিন্তু রাজেনবাবু তা পছন্দ করতেন না। কিন্তু শেষের বার যখন খাবার পাঠালাম—নবাব সাহেবের কাছে শুনলাম আমরা যে খাবার পাঠিয়েছি—তা উনি পাননি। বরং আমাদের নাম করে যে খাবার তাঁকে দেওয়া হয়েছে—তা খেয়ে নাকি তাঁর স্টমাক্ আপ্‌সেট হয়েছিল। সেটাই আমাদের পক্ষে রেড সিগন্যাল। তারপর অনেকবার নবাব সাহেব আমাকে ও দাদুকে তাঁর খাবারের কষ্টের কথা বলেছেন—কিন্তু আমরা আর কোন চক্রান্তের শিকার হতে রাজি হইনি। শুনেছি রাজেনবাবুই তাঁর খাবারের তদারক করতেন। তাঁর স্ত্রী নাকি রান্না করে পাঠাতেন মাঝে মাঝে। নতুবা ড্রাইভার কাম-কুক। তবে এই লোকটি বিশেষ সুবিধার ছিল না।

—তবে সেতারার সন্দেহ কি একেবারে ভ্রান্ত নয়?

—কি করে বলব বলুন। তবে উনি যখন সেতারাদের বিশ্বাস করতে বা স্ট্যাণ্ড করতে পারতেন না—তখন ওদের জানিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনে কি লাভ? এ জন্য তিনি অ্যালুফ ছিলেন। তবে তাঁর এই বিশ্বাস দৃঢ়।

—ডেড বডি কি পোস্টমর্টাম্ করা হয়েছে?

—তেমন কোন সন্দেহের আভাস কেউ দেয়নি। ওঁনার আত্মীয়রা কেউ আসেননি। উনি আগেই বেগম সুরাইয়ার পাশে তাঁর কবর তৈরি করে রেখেছিলেন। এখানকার বন্ধুবান্ধবরা সেখানে তাঁর ক্রিমেশনের ব্যবস্থা করেছিল। তাঁর উইলানুসারে সলিসিটার ও দাদু তাঁর সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকায় তাঁর ইচ্ছামত ব্যবস্থা করেছেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রবীন বলল, সম্পদ না থাকা যেমন ভাল নয়, তেমনি থাকাও নিরাপদ নয়।

—কথাটা সত্য। দাদু অনেকদিন হতে এমন একজন কাউকে খুঁজছিলেন যাকে দিয়ে দুটি নবাব বংশের এই সুখ দুঃখের কাহিনী লিখিয়ে রাখতে পারেন।

আমাদের পারিবারিক আঘাতের পর আঘাত ওঁনাকে অকালে বার্ধক্য জরাগ্রস্থ করেছিল। তবে উনি কখনও অন্যায় ভাবে টাকা রোজগার করেননি। তাই আজ কেবল পৈত্রিক এই বাড়ি নয়, তাঁর আসবাবপত্র বিক্রি করে তাঁকে ঋণ মুক্ত করতে হচ্ছে।

—আপনি তবে কি করে বিদেশে যাবেন?

—দাদু তাঁর যথাসর্বস্ব ঋণ ভারাক্রান্ত করে গেছেন বটে, কিন্তু আমার বাবার টাকা, দিদার, আমার মা'র গয়না, ইত্যাদি যা ছিল—সেগুলি সযত্নে আমার নামে ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। সেগুলি থাকায় বেশ কিছুকালের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারব। তারপর ডিগ্রীটা পেয়ে গেলে যত্র তত্র একটা চাকরি জুটিয়ে নেব।

রবীন তার পোর্ট ফলিও হতে একটা কার্ড দিয়ে বলল, যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয়—বন্ধুকে জানাবেন। এই রইল আমার ঠিকানা। সঙ্কোচ করবেন না। রথীনের মত আমি ধনী নই। আমি আপনার মতই সাধারণ একজন। কোন দিন যদি আপনার সামান্যতম উপকার করতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করব।

রমা হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে বলল, নিশ্চয়ই তেমন দিনে ডাক দেব। সাড়া দেবেন আশাকরি। আপনার কাহিনীর শেষাংশে আমার হতভাগ্য দাদুর কথাও লিখতে ভুলবেন না। লেখা হলে এক কপি বই আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন আশাকরি।

—কিন্তু আপনার ঠিকানা তো আজ হতে আমার কাছে অজ্ঞাত হয়ে পড়ল, মিস সোম।

বিষাদ মলিন হাসি টেনে রমা বলল, বন্ধু বলে ডেকেছেন যখন ঠিকানা আপনাকে নিশ্চয় দেব। এই কয়েকটি দিন এখানেই আছি বলে একটা হোটেলের ঠিকানা দিলাম। তারপর বিদেশে পৌঁছে ঠিকানা জানাব।